জেনারেলদের কবলে পাকিস্তান

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না হাস্‌সান হাফিজাহুল্লাহ

জেনারেলদের কবলে

পাকিস্তান

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না হাসসান হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও পরিবেশনা

AN-NASR

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৫

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক রাষ্ট্রযন্ত্র.....১০

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বছরগুলোতে তাদের ভূমিকা ১৫

প্রাথমিক বছরগুলোতে দেশীয় রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ.....২০

প্রাথমিক বছরগুলোতে রাজনীতিবিদদের মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর প্রভাব ও গভীরতা.....২১

প্রাথমিক বছরগুলোতে আমেরিকান স্বার্থাধীন পাকিস্তানী রাজনীতির অবস্থা.....২৪

পাকিস্তানের উপর জেনারেলদের ক্ষমতা ২৭

মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা.....২৮

ইস্কান্দার মির্যার পরিচয়.....২৯

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইস্কান্দার মির্যার ভূমিকা ৩১

খাজা নাযীমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কাল.....৩২

১৯৫৩ সালে লাহোরে পাকিস্তানের প্রথম মার্শাল ল এবং খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সাথে শত্রুতা.....৩৪

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ও ইস্কান্দার মির্যা..... ৩৬

ইসকান্দার মির্যা চতুর্থ ও সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে ৩৯

ইসকান্দার মির্যার ইসলাম ও শরীয়তের সাথে শত্রুতা..... ৪১

জেনারেল আইয়ূব খান ও পাকিস্তানে প্রথম মার্শাল ল ৪৫

আইয়ূব খানের পরিচিতি.....৪৭

জেনারেল আইয়ূব খানের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ.....৪৯

জেনারেল আইয়ূব খানের ইসলামের সাথে দুশমনী.....৫২

জেনারেল আইয়ূব খান ও আমেরিকার গোলামী.....৫৯

জেনারেল আগা ইয়াহইয়া খানের শাসন ৬৩

আগা ইয়াহইয়া খানের পরিচিতি..... ৬৯

জেনারেল ইয়াহইয়া খানের শাসনকাল.....৭০

জেনারেল ইয়াহইয়া ও বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর গণহত্যা..... ৭১

জুলফিকার আলী ভুট্টো ও কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল গুল হাসান.....৭৩

জেনারেল জিয়াউল হকের শাসন.....৭৭

জিয়াউল হকের পরিচিত.....৭৯

ব্লাক সেপ্টেম্বর, ফিলিস্তিনীদের হত্যা ও জিয়াউল হক ৮০

আফগানিস্তানে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিয়ার অংশগ্রহণের হাকিকত ৮২

জেনারেল জিয়াউল হক ও আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব..... ৮৬

জেনারেল জিয়ার ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক..... ৮৮

জিয়াউল হকের পাকিস্তানে ইসলাইজেশনের প্রচেষ্টাসমূহ..... ৮৯

জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যু এবং জেনারেল আসলাম বেগের কর্মকৌশল ...৯৩

শেষকথা: সেনাবাহিনীর জেনারেলরা পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে না। বরং তারা পাকিস্তান ধ্বংসের কারণ ৯৫

জেনারেল রাহেল শরীফ ও তার স্থলাভিষিক্ত কাদিয়ানীপ্রেমী জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়াহ..... ৯৬

পাকিস্তানের প্রকৃত রক্ষক ও কল্যাণকামী হলেন মুজাহিগণ ১০০

****

الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ وآلِه وصحبِه ومن والاه.

ভূমিকা

পাকিস্তানের বিগত দু'বছরের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি দিলে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে, একজন ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে ছেয়ে আছে। সে আর কেউ নয়; জেনারেল রাহিল শরীফ। দেশের প্রকাশ্য শাসকগোষ্ঠী (তথা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় মন্ত্রীপরিষদ, প্রাদেশিক মন্ত্রীবর্গ ও মন্ত্রীপরিষদ) এবং জনপ্রতিনিধি ইত্যাদি তো একের পর এক আকর্ষণীয়ই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের পরিচালক জেনারেল রাহিল শরীফই রয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল, সিপাহসালারের শক্ত হাত এ দুই বছর দেশকে কোন পথে পরিচালিত করল? তার সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো: ইসলাম থেকে দূরে আর আমেরিকার

নৈকট্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইসলামের দাবিদারদের জন্যই ইসলামের উপর আমল করা কঠিন হয়ে গেছে। মাদারাসা ও মসজিদগুলোর উপর কড়া নজরদারি করা হচ্ছে। দ্বীনদারিকে কট্টরতা নাম দিয়ে দ্বীনদারদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। সমাজে তাদেরকে কম আধুনিক হিসাবে পরিচিত করা হচ্ছে। মুজাহিদগণকে তো 'ওয়াজিবুল কতল' (যাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব) হিসাবেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আদালতের বাইরেও কৃত্রিম পুলিশী লড়াইয়ে মাধ্যমে দ্বীনদার নওজোয়ানদেরকে বেছে বেছে শহীদ করা হচ্ছে।

এই জেনারেলগণ পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের যিম্মী বানিয়ে রেখেছে। এ দুই বছর রাজনীতিবিদরা জেনারেলদের ফায়সালার সামনে অসহায় হয়ে থেকেছে। সামরিক ধারার পাকিস্তান অর্ডিনেন্স পাস হয়েছে। অগণতান্ত্রিক অনেক সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার রায়কে অন্য কোন জায়গায় চ্যালেঞ্জ করা যায় না। আর এ ধরণের আদালতগুলোতে মৃত্যু অথবা আজীবন কারাদন্ডের চেয়ে নিম্নমানের কোন শাস্তি নেই।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এতটা রূদ্ধ করা হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত বই-পত্রগুলোকে সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেশীয় পত্রিকাগুলোও দেশের মধ্যে সেনাবাহিনীর যেকোন কাজকে সব ভাল বলা ব্যতিত ভিন্ন কিছু প্রচার করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। যেন প্রতিরক্ষার সাথে সাথে দেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সকল

কার্যক্রম, গোয়েন্দাবৃত্তি, আইন প্রণয়ন... সবই সেনাবাহিনীর জেনারেলদের হাতে। আর সেনাবাহিনীর জেনারেলরা পুরো দেশটিকে পশ্চিমা মনিবদের ঝুলিতে রেখে দিয়েছে।

এই চিত্র গত দু'বছরে পাকিস্তানে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ সকল চিত্রগুলোতে... যে লোক সকাল-সন্ধ্যা, 'গণতন্ত্র' ও 'পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব'র গান গাইতে গাইতে একটুও ক্লান্ত হত না, যে সেনাবাহিনীকে ১৯৭৩ সালের আইন দেখাতে দেখাতে একটুও থেমে যেত না, সে একেবারে নিশ্চুপ। 'সিভিল সোসাইটি' ও 'লিবারেল আনাসি' ইত্যাদি সংগঠনগুলো, যেগুলো সর্বদা এ দেশে 'স্বাধীনতা ও সমতা' প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকত, তারাও একেবারে চোখ বুজে বসে আছে।

যখনই এ দেশে ইসলাম বাস্তবায়নের নাম নেওয়া হয়, তখনই তারা সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমতার স্লোগান তোলে, কোমর বেধে নামে। শরীয়ত বাস্তবায়নের মধ্যেই তাদের 'জনগণের সার্বভৌমত্ব', রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইনের মর্যাদা লঙ্ঘন দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যদি এই লঙ্ঘনই সেনাবাহিনী করে, যদি সেনাবাহিনীর লাঠি চলতেই থাকে, তখন সবাই মুখ বন্ধ করে বসে থাকে।

এ সকল সংগঠন ও সেনাবাহিনীর মাঝে সব বিষয়ে বহু মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে তারা সবাই একমত, তা হল: এ দেশে ইসলামের কোন কর্তৃত্ব আসার

সুযোগ দেওয়া হবে না। আর পশ্চিমা সভ্যতা ও মূল্যবোধের নামে ইসলাম বিরোধী ও ধর্মহীন রীতি-নীতি চালু করা হবে।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দ্বীনদারদের জীবনযাপন সংকীর্ণ করে তোলা হয়েছে। এমনকি পরিশেষে দ্বীনদারগণও তাদের অঙ্কিত নকশার উপর চলা শুরু করে দিয়েছে এবং ঐ সকল নকশাগুলোকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে দেখার পরিবর্তে সময়োপযোগী হিসাবে দেখছে। পরিতাপের বিষয়! কিছু লোক ওযরখাহীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এ কাজ করা শুরুও করে দিয়েছে।

এ সকল বিষয়গুলো আমাদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করেছে যে, আমরা দেশের দ্বীনদার ও সাধারণ জনসাধারণের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরি। তাদেরকে একথা বুঝাই যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা পাকিস্তানে প্রথম দিন থেকেই গণতন্ত্রের নামে ধোঁকার নীতি অবলম্বন করেছিল। যাতে করে এর মাধ্যমে সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা যায়, পাকিস্তানী মুসলিমদের মস্তিস্ক থেকে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মুছে ফেলে তাতে পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা ভরে দেওয়া যায়। ইসলামের নামে মুনাফেকী ও নাস্তিকতা সমাজে ব্যাপক করে দেওয়া যায় এবং লোকদের মধ্যে দুর্বল নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়।

অপরদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বৃটেন ও আমেরিকা, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে সেনাবাহিনীকে। আমেরিকা ও বৃটেন ভাল করে জানত এবং এখনও জানে যে, এই সেনাবাহিনী-ই এ দেশে দ্বীনদারদের ক্ষমতা ঠেকানোর ক্ষেত্রে মূলশক্তি।

পাকিস্তানের গোটা ইতিহাসের ফলাফল নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে চলে আসে:

১. পাকিস্তানের মূলশক্তি হল: এখানকার সেনাবাহিনী ও জেনারেলরা। তারাই পাকিস্তানের আসল শাসক।

২. এই সেনাবাহিনী ও জেনারেলরা মূলত: পাকিস্তানে আমেরিকা ও বৃটেনের প্রতিনিধি। তাদের বিশ্বস্ত গোলাম এবং নিমক হালাল কর্মকর্তা।

৩. এই সেনাবাহিনীর জেনারেলরা ইসলামের দুশমন, দ্বীনবিরোধী এবং পাকিস্তানে ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায়।

এ তিনটি বিষয়কেই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করার জন্য এই লেখাটি লেখা হল। আর এ লেখার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরই রেফারেন্স পেশ করা হবে, যারা নিজেরাই এই নিকৃষ্ট খেলার অংশীদার ছিল। আমরা এ থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি!

আল্লাহ আমাদেরকে সকল অবস্থায় সঠিক বুঝ দান করুন। দুশমনকে চেনার যোগ্যতা দান করুন। আমরা যে দ্বীনের নাম নিচ্ছি, আমাদেরকে তার উপর

আমলকারী বানান এবং যে দেশকে এই দ্বীনের নামে নেওয়া হয়েছে, সেখানে সেই দ্বীনেরই জয়গান গাওয়ার তাওফিক দান করুন। (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক রাষ্ট্রযন্ত্র

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দু'টি বিষয় জানা অতীব জরুরী:

প্রথম বিষয়: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোন কোন শ্রেণী অংশ গ্রহণ করেছে এবং কি পরিমাণ?

দ্বিতীয় বিষয়: 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা' হিসাবে এর রাষ্ট্রযন্ত্র কাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল?

অথচ পাকিস্তানী নেতৃত্বের পরবর্তী ইতিহাস এ দু'টি বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুস্তান স্বাধীনতা আন্দোলন, যেটা পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে, সেটা দেড়শত বছরের ইতিহাসের নাম। তার সূচনাকারীদের মধ্যে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের মুজাহিদগণ ব্যতিত দ্বিতীয় কেউ শরীক ছিল না। তাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের শাসনের অস্বীকৃতি ও ধ্বংস সাধন করা। এটি খালিছ ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার সর্বশেষ বড় প্রচেষ্টা

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. এর "রেশমী রোমাল আন্দোলন" রূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

যেহেতু এই প্রচেষ্টাগুলো প্রকৃত ফলাফলের মুখ দেখতে পারেনি, আর বিশেষকরে দুশমনরা এর মোকাবেলায় একটি মুহূর্তও হাতছাড়া করেনি, এজন্য এ আন্দোলনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে বৃটিশরা ওই সকল প্রচেষ্টা ও আন্দোলনগুলোকে জনপ্রিয়তা অর্জন করার সুযোগ করে দেয়, যারা বৃটিশদের সাথে সংঘর্ষের রাজনীতির পরিবর্তে বুঝা-পড়ার রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিল।

এ সকল আন্দোলনের সময়কাল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ সময়ের ভেতরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনটিকে মৌলিকভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হয়। ওই সকল লোকই একে দাঁড় করায়, যারা স্যার সাইয়্যেদের মতাদর্শের বাহক ছিল। তাতে দ্বীনকে ভিত্তি বানানো হয়নি। এই জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'। আর এর বিপরীতে কংগ্রেসের ভিত্তিও জাতীয়তাবাদের উপর ছিল।

কিন্তু যখন হিন্দুস্তান বিভক্তি বাস্তবতায় রূপ নিতে দেখা গেল, তখন উলামায়ে কেরামও তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের প্রচেষ্টায় কিছু জাতীয়তাবাদের পূজারী নেতাও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য জাতীয়তাবাদের সাথে ধর্মীয়

ভিত্তিও গ্রহণ করে। এভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনটি প্রধান গ্রুপ অংশগ্রহণ করে:

১. ইসলামপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ।

২. সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদগণ।

৩. উলামায়ে কেরাম।

উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের লাগাম সেই জাতীয়তাবাদীদের হাতেই থাকে, যাদের অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী ছিল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দু'একজনকে অবশ্যই ইসলামপ্রেমী তালিকায় উল্লেখ করা যায়। তাই তাদের জন্য আমরা ইসলামপ্রেমী পরিভাষাটি ব্যবহার করব। কারণ তারা ইসলামের ব্যাপারে ফরজ পরিমাণ ইলম রাখত, আর পাকিস্তানের মধ্যে ওই পরিমাণ ইসলামই চাইত, যতটুকু তাদের ইলমে ছিল।

কিন্তু মুসলিমলীগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদীদের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীরাই মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়েছে। আর তাদের সাথে সে সকল জায়গীরদাররাও যুক্ত হল, যারা বৃটেনের শাসনামলে ইংরেজদের বিশ্বস্ত খাদেম

ছিল। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রথম মন্ত্রীপরিষদের দিকে তাকালেই এই হাকিকত স্পষ্ট হয়ে যায়।

উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিমলীগের পরিপূর্ণ সমর্থন করেছেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে তার সমর্থনে প্রস্তুত করেছেন। কারণ মুসলিম লীগ ওয়াদা করেছিল, তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাতে ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই রাজনীতিবিদরা উলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দিতে শুরু করল। খুব দ্রুত তাদেরকে দেশীয় রাজনীতি থেকেই নিষ্ক্রিয় করে দিল।

পাকিস্তানের প্রথম দু'জন গভর্ণর জেনারেল ও দু'জন প্রধানমন্ত্রীকে ঐতিহাসিকরা টেনেটুনে কোনভাবে ইসলামপ্রেমীদের কাতারে শামিল করতে পারবে, যদিও পাকিস্তানে প্রকৃত ইসলাম কার্যকর করা তাদের দূর-দৃষ্টিতেও ছিল না। কিন্তু তৃতীয় গভর্ণর জেনারেল ও তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর তো ইসলামের সাথে কোন যোগসূত্রই ছিল না।

লিয়াকত আলী খানের হত্যা এবং খাজা নাযীমুদ্দীনের পদচ্যুতির সাথে সাথেই পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিম লীগ পাকিস্তানের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভূমিকাহীন হয়ে পড়ল। এটা মাত্র চার বছরে হয়ে যায়। আর এ চার বছরেও পাকিস্তানে তা-ই হয়েছে, যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র চেয়েছে।

এবার আপনাদের এটা জানতে হবে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র কাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল? বৃটিশরা নিজেদের শাসনামলে হিন্দুস্তানের শাসন পরিচালনার জন্য "ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস" এর শাসনব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়েছিল এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য স্থানীয় লোকদের নিয়ে 'রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি' গঠন করেছিল। হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় এ দুই প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করে দুই রাষ্ট্র, তথা পাকিস্তান ও ভারতকে দেওয়া হয়েছে।

এই সিভিল সার্ভেন্ট, যা বৃটিশ আমলে বৃটিশদের বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করেছে এবং তাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল, এদের দ্বারাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়। অপরদিকে পাকিস্তানী ফৌজও ঐ সকল লোকদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, যারা পূর্বে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে বৃটিশদের আনুগত্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে এবং তাদের নুন খেয়ে বেড়ে উঠেছে।

বরং মজার বিষয় হল, বৃটিশ আমলের অনেক সিভিল সার্ভেন্টই পাকিস্তানের প্রথমদিকের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে যায় এবং শাসন পরিচালনা করতে থাকে। এদের মধ্যে ইসকান্দার মির্যা, মালিক গোলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী এবং মালিক ফিরোজ খানের নাম তালিকার শীর্ষে আছে।

এতে জানা গেল যে, যে মুসলিমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর নামে এত কুরবানী পেশ করল এবং যে উলামায়ে কেরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়ন করার

প্রতিশ্রুতির কারণে মুসলিম লীগের সঙ্গ দিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে তারা সকলে ভূমিকাহীন হয়ে পড়ল এবং পাকিস্তান ফিরিঙ্গী গোলামদের হাতেই আবার এসে গেল। আর তাদের মধ্যেও যারা ফিরিঙ্গীদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত গোলাম ছিল, তাদের হাতে এসে গেল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বছরগুলোতে তাদের ভূমিকা

একথা অধিকাংশ পাকিস্তানী-ই জানে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে মুসলিমদের ভর্তি করে এ দেশের সেনাবাহিনী গঠন করা হয়নি। বরং রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকেই দু'ভাগ করে এক ভাগ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নামে পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখানেও সেরকম ভাগই করা হয়েছে, যেভাবে রেড কালভ বাউন্ডারী কমিশনের সীমা নির্ধারণ ও মাউন্টেন বেটনের নেতৃত্বে আসবাব-পত্র বণ্টন হয়েছিল।

রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি বৃটেনের বড়ত্বের একটি নিদর্শন ছিল। এই রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির শক্তিতেই বৃটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খেলাফতে উসমানীয়া ও জার্মানিকে পরাজিত করেছিল। ইরাক, শাম, ফিলিস্তীন ও মিশরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এই রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির যোদ্ধারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের সম্মান বাঁচিয়েছে, যখন হিটলার ও জাপানীয়দের হাতে প্রাথমিক বছরগুলোতে তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির শক্তিতেই হিন্দুস্তানের উপর বৃটিশরা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে এবং এখানকার স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

এ কারণে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ও জওয়ানরা বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েরই সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্য গোলাম ও বিশ্বস্ত চাকর ছিল। এই ভিত্তিতে পাকিস্তানী ফৌজও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বৃটেন ও আমেরিকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে। বৃটিশদের অন্তরে রাজনীতিবিদদের থেকেও আমলাতন্ত্রের প্রতি এবং আমলাতন্ত্র থেকে সেনাবাহিনীর প্রতি বেশি আস্থা ছিল। এই নির্ভরতার কারণে শুরু থেকেই নিজেদের জেনারেল কর্মচারীদেরকে বৃটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানী রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে পুরো পাকিস্তানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহতভাবে বজায় রেখেছে।

নববর্ধিত পাকিস্তানী ফৌজের সাথে বৃটেন সর্বপ্রথম এটা করে যে, একটা সময় পর্যন্ত ইংরেজ অফিসাররাই পাকিস্তানী ফৌজের নেতৃত্ব দেয়। ১৯৫১ পর্যন্ত স্থল, ১৯৫২ পর্যন্ত নৌ এবং ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিমানবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ সকলে ইংরেজ অফিসার ছিল। তারপর জুনিয়র পাকিস্তানী অফিসারদেরকে খুব দ্রুত

প্রমোশন দিয়ে উপরে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে বিশেষভাবে পশ্চিমা দেশগুলোতে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

যখন বৃটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে এই আস্থা আসত যে, এ ব্যক্তি এখন আমাদের নিজেদের লোক, তখনই তাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের কাছে সোপর্দ করত। জেনারেল আইয়ূব খান, যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম পাকিস্তানী কমান্ডার ইনচিফ হয়েছে, সে নিজের নিয়োগের ব্যাপারে নিজের আত্মজীবনীর মধ্যে লিখেছে:

“জেনারেল গ্রেসী (যে সে সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ ছিল) আমার নিয়োগের শুভ ঘোষণা দিল। আমাকে উপ কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দিল। যাতে আমি নিজেকে কাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারি। আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জার্মান ও ইংল্যান্ড গেলাম, যাতে সেনাবাহিনীর নিয়ম-নীতি শিখতে পারি।”

জেনারেল আইয়ূব খানকে জার্মান ও ইংল্যান্ড এজন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল, যাতে তাকে ভালভাবে পশ্চিমা রঙ্গে রঙ্গীন করে দেওয়া যায়। আর হয়েছে তাই। এই জেনারেল আইয়ূব খান পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সিস্টেম ও রীতি-নীতি আমেরিকার আদলে সাজিয়েছে, যার আলোচনা সামনে আসবে।

জেনারেল আইয়ূব খান জীবনভর রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির নিমকহালালী করে গেছে। এখানে তথ্যসূত্র হিসাবে জেনারেল আইয়ূব খানের সেই বক্তব্যটি উল্লেখ

করলে আশা করি উপকার থেকে খালি হবে না, যা সে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে বলেছিল, যখন ৯জুন ১৯৫৮ সালে ফিরোজ নুন তার চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে সময় জেনারেল আইয়ূব খান যা বলেছিল:

আমার চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আপনার যে উদারচিত্ততার প্রমাণ মেলেছে, তাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি রিটায়ার্ট হলে যতটুকু খুশি হতাম, সে পরিমাণই আমি এর উপরও সন্তুষ্ট যে, আমাকে এই বিশাল সেনাবাহিনীতে আরো অধিক খেদমত করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, যে সেনাবাহিনীর গঠনই আমার জীবনের মিশন। যে ফায়সালাই হোক (রিটায়ার্টমেন্ট বা মেয়াদবৃদ্ধি) আমি এটা স্বীকার করি যে, আমি বিগত ৩১ বছর ধরে এর নুন খেয়ে আসছি এবং আমি যা কিছু হই; সব এই সেনাবাহিনীর কারণেই, আর আমি এই সেনাবাহিনীর সাথেই সম্পর্কিত।

লক্ষ্য করুন, এখানে জেনারেল আইয়ূব খান স্পষ্টভাবেই স্বীকার করছে যে, সে যেই সেনাবাহিনীর নুন খেয়ে এতটুকু এসেছে, তা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি হিসাবে চলতে চলতে পরবর্তীতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হয়েছে এবং যে লবণ সে পাকিস্তান হওয়ার আগে খেয়েছে, সেটা হালাল করার প্রতিও তার আন্তরিক ইচ্ছা।

এভাবে বৃটেন পাকিস্তানী ফৌজকে এর উপযুক্ত করে দিয়েছে যে, যখনই কখনো দেশ বৃটেন ও আমেরিকার সিস্টেম অনুযায়ী চলবে না, তখনই সেনাবাহিনী তাকে

সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং দেশীয় রাজনীতি একচ্ছত্র ক্ষমতাশালী সেনাবাহিনীর প্রভাবাধীনে আমেরিকা ও বৃটেনের অঙ্কিত নকশার উপরই চলমান থাকবে।

এটা এমন বিষয়, যার সত্যতার জন্য অন্য কোন দলিল না থাকলেও স্বয়ং ইতিহাসই এর অনেক বড় নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে। যদিও আমাদের কাছে ভুরিভুরি প্রমাণও আছে। পাকিস্তানের প্রথমদিন থেকেই দেশীয় রাজনীতি সেনাবাহিনীর শুধু প্রভাবাধীনই থাকেনি, বরং ইতিহাসের দুই তৃতীয়াংশ সময় তো সরাসরি সেনাবাহিনীর শাসনই দৃষ্টিগোচর হয়।

লেখক হার্বার্ট ফিল্ডম্যান তার "দি ইন্ড এন্ড দি বিগিনিং পাকিস্তান" নামক বইয়ের মধ্যে পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন:

যখনই জি এইচ কিউ এর মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, অবস্থা সিনিয়র সামরিক অফিসারদের রুচি ও চাহিদামত যাচ্ছে না, তখনই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীসমূহ (প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র বড় সেনা) নড়েচড়ে উঠে অথবা হস্তক্ষেপ করার জন্য কৌশল করতে থাকে।

প্রাথমিক বছরগুলোতে দেশীয় রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমনটা যেকোন নবগঠিত রাষ্ট্রের হতে পারে। যে সময়, এখনো রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতিই নেই। স্বয়ং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই জন্মের প্রাথমিক স্তরগুলো পার করছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সেই সেনাবাহিনীই ছিল, যা পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল।

তার অনিবার্য ফলাফল এই বেরিয়ে আসল যে, এই প্রতিষ্ঠানটিই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও জড়িত হল। এর সাথে সাথে যেহেতু বৈদেশিক দিক থেকেও রাষ্ট্রটির ভারতের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সামলানো জরুরী ছিল, এ কারণে তার সমাধানও এই প্রতিষ্ঠানটিই করত। ফলে-

১. মুহাজিরদের পুনর্বাসন

২. বিশৃঙ্খলা দমন

৩. স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশগুলোর অন্তর্ভূক্তি

৪. সীমান্তগুলোর হেফাজত

৫. কাশ্মীর যুদ্ধ

সবকিছুর মধ্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রতিষ্ঠার পরই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অন্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে যায়। আর বৃটেন ও আমেরিকার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম সুযোগ অর্জিত হয়ে যায়।

প্রাথমিক বছরগুলোতে রাজনীতিবিদদের মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর প্রভাব ও গভীরতা

প্রাথমিক বছরগুলোতেই রাজনীতিবিদদের মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর প্রভাব ও গভীরতা খুব স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে। তার প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যখন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল ডিগ্লেস গ্রেসীকে কাশ্মীরের দিকে সেনা মোতায়েনের আদেশ দিল, কিন্তু সে অস্বীকার করল। অত:পর পরবর্তী দিনই ভারত ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার আকিনলেক এসে জিন্নাহ থেকে আদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নিল।

মেজর জেনারেল শাহেদ হামিদ, যে সে সময় জেনারেল আকিনলেকের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল, সে তার বইয়ে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখে:

২৭ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে তিনি (জিন্নাহ) গ্রেসীকে আদেশ দিল যে, সৈন্যদেরকে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রেরণ করুন, আর শ্রীনগর ও 'দারাহ বানিহাল'এর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলুন। গ্রেসী জবাব দিল: সে আদেশ-নিষেধ পালন করতে পারবে না। আর এ বিষয়টি তার আকিনলেকের নিকট রিপোর্ট করা জরুরী।

আদেশ-নিষেধ পালন করার অনিবার্য ফলাফল ছিল "স্ট্যান্ড ডাউন অর্ডার নম্বর ২" এর প্রয়োগ হবে। যার উদ্দেশ্য দাঁড়ায় পাকিস্তানী আর্মি থেকে বৃটিশ অফিসারদের আলাদা হয়ে যাওয়া। গ্রেসীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ওয়িলসনের রিপোর্ট অনুযায়ী মাউন্ট বেটন গ্রেসীকে ফোন করে এই ধমকি দেয় যে, সে যদি কাশ্মীরের দিকে সৈন্য মার্চ করে, তাহলে সে যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, সে নাইট হাড উপাধি পাবে না।

প্রথম দিকে যেহেতু উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী-প্রধানের উপর সুপ্রিম কমান্ডার ছিল, সে হল বৃটিশ জেনারেল আকিনলেক, যে পূর্বে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির কমান্ডার ইনচিফ ছিল এবং উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তারই অধীনে ছিল, এজন্যই গ্রেসী আকিনলেকের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং সাথে সাথে মাউন্ট বেটনও ফোন করে তাকে ধমকি দিয়ে বিরত রেখেছে।

এভাবে জিন্নাহর আদেশ পালিত হল না। বরং পরবর্তী দিন আকিনলেক এসে জিন্নাহ থেকে এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'মাস

পরের এই কাহিনীই ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের ইতিহাস হয়ে থাকে। পাকিস্তানে সেই শাসনই চলে, যা বৃটেন ও আমেরিকা চায়। আর এই বাধার জন্য স্থানীয়ভাবে ভূমিকা পালন করেছে এখানকার সেনাবাহিনী। আর রাজনীতিবিদদের অবস্থা সর্বদা মুহরীর মতই থাকে।

১৯৪৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান (যে ওই সময় মেজর জেনারেল ছিল) পূর্ব পাকিস্তানের জি ও সি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানে রাজনৈতিকভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। উর্দূ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্ধারিত হওয়ার কারণে বাঙ্গালী জনগণ ও ছাত্ররা এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করতে থাকে।

এই বছর জানুয়ারীতে ছাত্ররা নিজেদের দাবির জন্য আন্দোলন করছিল। তারা ইসেম্বলীর উপর হামলা করতে উদ্যত হল। আর তখন ইসেম্বলীর ইজলাস চলছিল, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযীমুদ্দীন বক্তব্য দিচ্ছিল। খাজা নাযীমুদ্দীন অবস্থা বেগতিক দেখে জি ও সি মেজর জেনারেল আইয়ূব খানের নিকট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার আবেদন জানায়। মেজর জেনারেল আইয়ূব খান ইসেম্বলীকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে নেয় এবং আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এ ঘটনা একদিকে রাজনীতিবিদদের এই দুর্বলতা প্রকাশ করে যে, দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণও সেনাবাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত যেভাবে আইয়ূব খান

আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করেছিল, তা এ কথারই ইঙ্গিত ছিল যে, দেশীয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী শক্তি ব্যবহার করতে একটুও পিছপা হবে না। যার কার্যকরী উদাহরণ পরবর্তী বছরগুলোতে বাস্তবরূপ ধারণ করে।

জানুয়ারী ১৯৪৮ সালের আন্দোলনে মুহাম্মদ আলী বুগেরাহও অংশগ্রহণ করেছিল, যে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। আর সে সময় সে অপজিশন লিডার ছিল। মেজর জেনারেল আইয়ূব খান জি ও সি হিসাবে তাকে এই শব্দ পর্যন্ত বলে:

“তোমরা কি গুলির অপেক্ষা করছ?”

এ কথা স্বয়ং আইয়ূব খান নিজের বইয়ে লিখেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাজনীতিবিদদের জন্য সেনাবাহিনীর এই স্মরণীয় ঘটনাটিই যথেষ্ট হয়েছে এবং সমগ্র ইতিহাসে এই ধমকির দাপটেই পাকিস্তানী ফৌজ দেশকে নিজেদের করায়ত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাথমিক বছরগুলোতে আমেরিকান স্বার্থাধীন পাকিস্তানী রাজনীতির অবস্থা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় রাজনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা ছিল যে, শুরুতেই পাকিস্তানী রাজনীতির কিবলা নির্ধারিত হয়ে যায় আমেরিকা। যেহেতু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের পরিবর্তে শক্তি আমেরিকার হাতে চলে এসেছিল, এমনকি স্বয়ং বৃটেনও আমেরিকার অনুগামী হয়ে যায়, এ কারণে পাকিস্তান প্রেক্ষাপটে এর ফল এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তানী রাজনীতিও শুরুতে বৃটেনের প্রভাবাধীন থাকার পর এখন আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

আর বৈশ্বিক পরিস্থিতি হিসাবে ভারত নিজেদের সম্পর্ক সৃষ্টি করল রাশিয়ার সাথে। অপরদিকে পাকিস্তান আমেরিকার কোলে ঢলে পড়ে। সেই যে সে সময় আমেরিকা কোলে তুলে নিল, আজ অবধি ছাড়ল না।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ এর মে মাসে আমেরিকার কোর্স করল। আর এটাই ছিল আমেরিকার সাথে সম্পর্কের সূচনা। আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে যেকোন প্রকার সহযোগিতা করার নিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করে আসল। ফলে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাকিস্তানী বিমানবন্দর লাভ করল এবং কোরিয়ান যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্বশরীরে অংশগ্রহণের দাবি করল।

১৯৫১ সালের জুনে আমেরিকা-কোরিয়া যুদ্ধ হল, যাতে পাকিস্তান আমেরিকার সাথে সহযোগিতা করল। কোরিয়ায় জাতিসঙ্ঘের মিলিটারী একশনকে সাপোর্ট দিল এবং কোরিয়ায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন বৃগেডকে পাঠাতে সম্মত হল, অথচ ভারত তা অস্বীকার করে দিয়েছিল।

আমেরিকা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করার ওয়াদা করেছিল। কিন্তু যখন পাকিস্তান ওয়াশিংটনের নিকট দাবি করল যে, তারা যেন ভারতীয় হুমকির ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে রক্ষা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়, তখন আমেরিকা তা প্রত্যাখ্যান করল। আমেরিকার অস্বীকৃতির কারণে পাকিস্তান কোরিয়ায় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল ঠিক, কিন্তু জাতিসঙ্ঘের কার্যাবলীর রাজনৈতিক সহযোগিতা করল।

কোরিয়ান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারত পাকিস্তানের পাঞ্জাব সীমান্তে নিজেদের সৈন্য মোতায়েন করে। পাকিস্তানের নিকট প্রতিরক্ষা করার মত সামরিক সামর্থ ছিল না। এজন্য অসহায় শাসক ভীত হয়ে আমেরিকার দিকে তাকাতে লাগল। আমেরিকা পাকিস্তানকে সহযোগিতা করল। ওই সময়ই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুমান পাকিস্তানকে আমেরিকার সম্মুখ সারির জোট বলে স্বীকৃতি দিল।

এই ধারাবাহিকতা এখানেই থেমে যায়নি। বরং পরবর্তী বছরগুলোতে তা আরো গভীর হয়েছে। তারপর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাথে ‘বাগদাদ পেক্ট’ এ (যেটা পরবর্তীতে ‘সেন্টু’ নামে পরিচিতি লাভ করে) অংশগ্রহণ করে। এই চুক্তিটি নিরেট আমেরিকান চুক্তি ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা। এই চুক্তির মধ্যে পাকিস্তান দস্তখত করে এবং তার ফলে আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করে। এই চুক্তি মোতাবেক

পাকিস্তান আমেরিকাকে "পেশোয়ার এয়ার ভাইস" কন্ট্রোলের সুযোগ দেয়, যেখান থেকে আমেরিকা রাশিয়াকে নজরদারি করার জন্য 'ইউ-২' বিমানগুলো উড়াত।

এছাড়া এ বছরেই পাকিস্তান আরেকটি আমেরিকান চুক্তি 'সেটো'এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। হয়ত এই উভয় চুক্তিতে আমেরিকার রাশিয়ার মোকাবেলায় তেমন কোন ফায়দা অর্জিত হয়নি এবং পাকিস্তানেরও তেমন স্বার্থ লাভ হয়নি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ ছিল, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তান আমেরিকান সাহায্য দ্বারা অনুগৃহিত হয়েছে। আর আমেরিকাও পাকিস্তানের উপর নিজের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত রেখেছে।

এই উভয় চুক্তিতে পাকিস্তানকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে অগ্রসর করার কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দু'জন জেনারেল। মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যা ও কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল আইয়ূব খান। কারণ পাকিস্তানের প্রাথমিক রাজনীতিতে এই দু'জনের নিকটই কেন্দ্রিয় শক্তি হস্তগত ছিল এবং এ উভয়জনই বৃটেন ও আমেরিকান স্বার্থের মুহাফিজ ছিল।

পাকিস্তানের উপর জেনারেলদের ক্ষমতা

উপরোল্লেখিত বিশ্লেষণ দ্বারা খুব ভালভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, কিভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই বৃটেন ও আমেরিকা পাকিস্তানী রাজনীতিকে পরিচালিত

করেছে এবং কিভাবে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যুক্ত করেছে। এখন এখানে কিছুটা বিশ্লেষণের সাথে জেনারেলদের আলোচনা করব, যারা পাকিস্তানী রাজনীতিতে মৌলিক ভূমিকা রাখে এবং যাদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা থাকে। তাদের ক্ষমতা পরিস্কার করার সাথে সাথে আমরা তাদের পদক্ষেপসমূহ, তাদের ব্যক্তিগত কর্মকান্ড এবং তাদের আমেরিকার গোলামীর অবস্থাও তুলে ধরব। যাতে পাকিস্তানের জনগণ এবং বিশেষকরে এখানকার ধর্মীয় শ্রেণী, যারা এখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বপ্ন দেখত এবং এখনো চোখে সেই স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে, তাদের সামনে পাকিস্তানে 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র প্রকৃত দুশমনদের চিত্র পরিস্কার হয়ে যায় এবং তাদের মোকাবেলার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারে।

মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা

১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে নিয়ে অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম ১১ বছর শক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী ব্যক্তি ছিলেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা। যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ডিফেন্স সেক্রেটারী হিসাবে কেবিনেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তারপর কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করতে করতে এক পর্যায়ে আগষ্ট ১৯৫৫ সালে দেশের গভর্ণর জেনারেল এবং তারপর মার্চে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যায়।

ইস্কান্দার মির্যার পরিচয়

ইস্কান্দার মির্যা সেই মীর জাফরের বংশধর, যার কারণে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করেছে, যার পরেই ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়। এই ইস্কান্দার মির্যা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির চোখ ও প্রদীপ ছিল। সে বৃটেনের কেন্দ্রিয় সামরিক প্রতিষ্ঠান "রয়েল মিলিটারী কলেজ সান্ড্রাস্ট" এ শিক্ষা গ্রহণ করে। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল: এই লোকই উপমহাদেশের প্রথম স্থানীয় ব্যক্তি, যে ওই কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। হিন্দুস্তান বিভক্তির পূর্বে সে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে ইংরেজদের ব্যাপক খেদমত করেছে। ১৯২০ এর ওয়াজিরিস্তান যুদ্ধে মাহসুদ ও ওয়াজিরিস্তানী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে।

তার কার্যক্রমে খুশি হয়ে ফিরিঙ্গিরা তাকে সামরিক বিষয়াদি থেকে বের করে ১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান পলিটিকেল' সোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে সীমান্তের স্টান্ট কমিশনার বানিয়ে দেয়। তারপর ১৯৪৮ সালে তাকে গোত্রীয় এলাকাসমূহের পলিটিকেল এজেন্ট বানানো হয় এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে এ পদে বহাল থাকে। তারপর ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সীমান্ত এলাকার পলিটিকেল এজেন্ট ছিল।

এটা মনে রাখতে হবে যে, এ সকল কাজগুলোর সময় সে রীতিমত রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ছিল এবং ১৬ জুলাই ১৯৪৬ সালে তাকে লেফটেনেন্ট

কর্ণেল পদবীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। এ ব্যক্তির অনন্য কার্যাবলী দেখে বৃটেন সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে ১৯৪৬ সালে সমগ্র হিন্দুস্তানের জয়েন্ট ডিফেন্স সেক্রেটারী পদ দিয়ে দিবে।

এই পদে থাকা অবস্থায়ই হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় বৃটেনের রাজা তার উপর এই খেদমতের দায়িত্ব সোপর্দ করে যে, যেন সে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিকে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের মাঝে ভাগ করে দেয়। বৃটেনের এই দীর্ঘ ও বিশ্বস্ত খাদেম পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের প্রথম ডিফেন্স সেক্রেটারী হয় এবং মিলিটারী পুলিশের জি ও সি হয়। এ ব্যক্তিই পাকিস্তানের প্রথম এগার বছরের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী, যার নেতৃত্বের ঝলক সামনে এ বিষয়ের আলোচনায় দেখা যাবে।

এখানে একটু থেমে চিন্তা করুন যে, যদি বৃটেনের এই বিশ্বস্ত গোলাম ও সেনা, যে হিন্দুস্তান স্বাধীনতার আন্দোলনের কর্মীদের (যাদের মধ্যে শাহযাদা ফযলে দ্বীন এবং ফকীর এপিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বিরুদ্ধে সামরিক ও সরকারী ময়দানে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে এবং নিজের ফিরিঙ্গি মনিবদের খুব নিমকহালালী করেছে। সে-ই নবজন্মা পাকিস্তানের প্রথম এগারো বছরে পাকিস্তানের শাসক ছিল। এতে আপনার নিজেরই অনুমান হওয়ার কথা যে, ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কি পরিমাণ স্বাধীন হয়েছিল?!

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইস্কান্দার মির্যার ভূমিকা

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি সাইটে ইস্কান্দার মির্যার ব্যাপারে লেখা আছে:

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ইস্কান্দার মির্যাকে প্রথম প্রতিরক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারী নিযুক্ত করে। যেটা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ। সে-ই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারতযুদ্ধের তদারকি করেছে এবং ১৯৪৮ সালে বেলুচিস্তানে সৈন্য মোতায়েনের তদারকি করেছে।

প্রকৃত কথা হল, পাকিস্তানে জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা আমেরিকা ও বৃটেনের গোয়েন্দা ছিল এবং তাদের শক্তিতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথম দিন থেকে সে আপন মর্যাদায় বিদ্যমান ছিল। লিয়াকত আলী খানের এটা অপরাগতা ছিল যে, তিনি জেনারেল ইসকান্দার মির্যাকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়াসয়ে সামনে রাখতেন এবং অধিকাংশ ব্যাপারেই ইস্কান্দার মির্যা থেকে পরামর্শ নিতেন।

এর একটি কারণ এও ছিল যে, লিয়াকত আলী খানের দেশীয় রাজনীতিতে গোলাম মুহাম্মদ, মুশতাক গোরমানী, মুমতাজ দোলতানা প্রমুখের মত কিছু বড় বড় নামের লোকদের প্রতি আস্থা ছিল না। ইসকান্দার মির্যা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে এতটা জড়িত ছিল যে, তারই পরামর্শের কারণে সিনিয়র অফিসারদেরকে বাদ দিয়ে লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার

ইনচিফ 'ডিগলেস গ্রেসী'র পরে জেনারেল আইয়ূব খানকে কমান্ডার ইনচিফ বানিয়েছে।

লিয়াকত আলী খানের হত্যার পরে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের জন্য আব্দুর রব নাশতারকে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী মনে করা হত। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মীয় মানসিকতার ছিলেন, এ কারণে তাকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেওয়া হয়নি। আর এর মধ্যে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে ইস্কান্দার মির্যা। এ ব্যাপারে ওইকিপিডিয়ায় লিখিত আছে:

লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর সরদার নাশতারকে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী মনে করা হত। কিন্তু তার নিয়োগে সিনিয়র সেকুলার ও ধর্মের লাগাম থেকে মুক্ত নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট মির্যা ইস্কান্দারও ছিল। এই নিয়োগ ঠেকানোর কারণ ছিল নাশতারের পশ্চাৎপদতা ও ইসলামপ্রিয়তা।

খাজা নাযীমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কাল

লিয়াকত আলী খানের পরে ইস্কান্দার মির্যা ও বৃটেনের সন্তুষ্টিতে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে খাজা নাযীমুদ্দীনকে গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়। তার এ কারণটি তো ভালভাবেই বুঝে আসে যে, সে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় লোক ছিল। কিন্তু এর সাথে সাথে সে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির

লোক ছিল, যে ক্ষমতায় থাকলে খুব সহজেই নিজের মতামত চালিয়ে দেওয়া যাবে। আর এমনটাই হয়েছে। মির্যা ইস্কান্দার বড় দু:সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে নিজের মতামত চালিয়ে দিতে লাগল এবং অধিকাংশ ফায়সালার মধ্যে এই ব্যক্তিই জড়িত থাকল।

কারামাতুল্লাহ গোরী ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে ডন পত্রিকায় বিউক্রেট জনাব কামরুল ইসলামের সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, যিনি নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি বর্ণনা করেন:

১৯৫৩ সাল। খাজা নাযীমুদ্দীনের মন্ত্রীপরিষদে লাহোর অচলকারী দলভিত্তিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উত্তপ্ত আলোচনার মাঝখানে ইস্কান্দার মির্যা, যে সে সময় মন্ত্রীপরিষদের সেক্রেটারী ছিল, সে দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ব্যতিতই কক্ষ থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সে দশ মিনিট পর মন্ত্রীপরিষদের সভায় ফিরে এসে সমস্ত উপস্থিত লোকদের মাঝে ঘোষণা দিল যে: এ নিয়ে আর নিজেদেরকে পেরেশান করার প্রয়োজন নেই। বরং সে লাহোরের কোর কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল আযম খানের সঙ্গে কথা বলেছে। সে আগামীকালই সেখানে সামরিক আইন প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত। এর দ্বারা সভা শেষ হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারোই সাহস হল না যে, ইস্কান্দার মির্যার সেচ্ছাচারি ফায়সালা ও অবমাননাকর সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ করবে।

এর দ্বারা অনুমান করুন যে, ইস্কান্দার মির্যার হাতে কী পরিমাণ শক্তি ছিল, যার কারণে এক তো সে স্বাধীন ফায়সালা করে, দ্বিতীয়ত: অন্য কেউ তার ফায়সালার ব্যাপারে আপত্তিও করতে পারে না।

১৯৫৩ সালে লাহোরে পাকিস্তানের প্রথম মার্শাল ল' এবং খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সাথে শত্রুতা

যেহেতু উপরোল্লেখিত চয়নিকাটিতে ১৯৫৩ সালের লাহোরের মার্শাল ল' এর উল্লেখ হয়েছে, এজন্য তার ব্যাপারেও কয়েকটি কথা লিখে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি। কারণ এ ঘটনাটি সরকার ও সেনাবাহিনীর ইসলামের সাথে দুশমনীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা যায় না।

এটা ছিল সে সময়, যখন সরকারের মধ্যে কাদিয়ানীদের প্রভাব ও গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাফরুল্লাহ খান কাদিয়ানী চলে আসছিল, যাকে সরকার অপসারণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ওই সময় দেশের মধ্যে উলামায়ে কেরাম আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রে কমপক্ষে কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পদসমূহ থেকে অপসারণ করা হয়। আমীরে শরীয়ত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ও মজলিসে আহরারে ইসলাম এ আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল। আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল লাহোর, যেখানে হাজার হাজার নবীপ্রেমিক রাস্তায়

বের হয়ে আসল। এছাড়াও মুলতান, ফয়সালাবাদ ও ঝুঙ্গে আন্দোলন চলমান ছিল।

ওই সময় ইস্কান্দার মির্যার সিদ্ধান্তে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী লাহোরে মার্শাল ল' জারি করল। আর এই মার্শাল ল' কার্যকরকারী শয়তান ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল আযম খান, যে কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল আইয়ূব খানের ঘনিষ্ট বন্ধু ও বিশ্বস্ত লোক ছিল। এ দু'জনের পিতাও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে ছিল। ওই সময় থেকেই তাদের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ব্যক্তিকে আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও নিজের মন্ত্রীপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সে সেসময় থেকে নিয়ে ১৯৬২ সালে নিজের রিটায়ার্টমেন্ট পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানে গভর্ণর ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, ১৯৬৪ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও জেনারেল আইয়ূব খানের মোকাবেলায় যদি ফাতিমা জিন্নাহকে বিরোধী দল হিসাবে দাঁড় করানো না হত, তাহলে তার নিকট বিরোধী দল হিসাবে প্রস্তুত করার জন্য এই মানবাকৃতির শয়তানটিই ছিল।

লেফটেনেন্ট জেনারেল আযমখানের নির্দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ লাহোরে টানা তিনদিন গণহত্যা চালাল এবং হাজার সংখ্যক নবীপ্রেমিককে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করল। সরকারী রিপোর্টসমূহে আজ পর্যন্ত সমস্ত দোষ খতমে নবুওয়াতের দায়িত্বশীলদেরকে দেওয়া হয়। অথচ হত্যাকারী জেনারেল ও অফিসাররা

পরবর্তীতেও রাজত্ব করতে থাকে এবং দেশে সম্মানের স্থানে বসে থাকে। এ ঘটনা সেনাবাহিনী ও তার জেনারেলদের ইসলামের সাথে শত্রুতার জলজ্যন্ত প্রমাণ। যেখানে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা, সেখানে খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতির জন্য বের হওয়া মুসলমানদেরকে হত্যা করা কোন হুকুমের মধ্যে আসে? নিশ্চিত, এটাও কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ও ইস্কান্দার মির্যা

লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর খাজা নাযীমুদ্দীন, যে ওই সময় গভর্ণর জেনারেল ছিল, তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর গভর্ণর জেনারেলের পদে একজন অসুস্থ লোককে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই অসুস্থ লোকটি ছিল মালিক গোলাম মুহাম্মদ। ওই সময় পাকিস্তানে গভর্ণর জেনারেলের পদটি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল।

গোলাম মুহাম্মদ নিজে একজন লোলা লেংড়া লোক ছিল, যার কথাও কারো বুঝে আসত না। তার সমস্ত রাজত্ব দু'জন ব্যক্তির শক্তিতে ছিল। আর সে দু'জন হল মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ূব খান। গোলাম মুহাম্মদের শাসনামলে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল এই দুই লোকের হাতে, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তারাই চালাত, আর এ দু'জনের পিছনে আসলে আমেরিকা ও বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল।

১৬ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে ইস্কান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ূব খানেরই আশির্বাদে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ খাজা নাযীমুদ্দীনকে পদচ্যুত করে। এ ব্যক্তিই ছিল সেই মুসলিম লীগের সর্বশেষ চিহ্ন, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। সরদার আব্দুর রব নাশতারকে তো প্রথমেই ইস্কান্দার মির্যা কোনঠাসা করে ফেলেছিল। অবশেষে খাজা নাযীমুদ্দীনকেও সে ও জেনারেল আইয়ূব খান মিলে পদচ্যুত করল।

পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিমলীগ, যারা প্রথম দু'বছরেই সকল কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল, অত:পর মাত্র ছ' বছরে রাজনীতি থেকেও একেবারে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় তাদেরকে। খাজা নাযীমুদ্দীন বৃটেনের রাণীর নিকট অভিযোগ জানায় যে, গোলাম মুহাম্মদ নিজের অধিকার থেকে সীমালঙ্ঘন করেছে। কিন্তু রাণীর পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসল না। আসলে সে কিভাবে তাকে সাহায্য করবে? কারণ বৃটেনের সন্তুষ্টি ওই দুই জনাবের হাতে ছিল।

বরং এর বিপরীতে আমেরিকায় পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলী বুগেরাহকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়োগের কথা আলোচনা করতে গিয়ে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ শিহাব নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

যখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল এবং এসেম্বলী অকার্যকর করার পর নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হল, তখন আইয়ূব খান কমান্ডার ইনচিফের পদের সাথে সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্বশীল হল। ইসকান্দার মির্যা এই নতুন মন্ত্রীপরিষদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ হয়। এই দুই জনাবের সাহচর্য মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদের জন্য অনেক বড় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। আর সম্ভবত এটাই সেই শক্তি ছিল, যার শক্তিতে সে এত সামনে বেড়েছিল। সে সময় এই মন্ত্রীপরিষদকে কেবিনেট অফ লেন্ট বলা হত।

যেহেতু গোলাম মুহাম্মদ ইস্কান্দার মির্যার হাতের খেলনা ছিল, এজন্য প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বুগেরাও যখন এই জনাবদের ইচ্ছার বিপরীতে কিছুটা গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার সূচনা করল, তখন ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে ইসেম্বলী বাতিল করে দেওয়া হয়। গোলাম মুহাম্মদের প্রকৃত শক্তির রহস্য বলতে গিয়ে কুদরতুল্লাহ শিহাব খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন:

আমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মিস্টার গোলাম মুহাম্মদ এত কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে, ভালমত চলাফেরাও করতে পারত না, কথা বলতে পারত না, বেশি লেখা পড়া করতে পারেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব প্রভাব ও দাপটের সাথে শাসন করতে থাকে। তাহলে তার শক্তির আসল রহস্য কি?

এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর: এক হল, মিস্টার গোলাম মুহাম্মদের শক্তির রহস্য ছিল রাজনীতিবিদদের দুর্বলতা। এ ছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি জবাব হল, জেনারেল ইসকান্দার মির্যার মধ্যস্থতায় মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদের পক্ষে কমান্ডার ইনচিফ আইয়ূব খানেরও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। যা অদৃশ্য আলো দ্বারা লিখিত ছিল। ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের উভয়ের আপন আপন পরিকল্পনা ছিল, যা মিষ্টার গোলাম মুহাম্মদের মত গভর্ণর জেনারেলদেরকে ক্ষমতায় বসানো ব্যতিত বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না।

ইসকান্দার মির্যা চতুর্থ ও সর্বশেষ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে

যখন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ চূড়ান্ত অসুস্থ হয়ে গেল, তখন সর্বশেষে ইসকান্দার মির্যা তাকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করল এবং ১৯৫৫ সালের আগষ্টে নিজে গভর্ণর জেনারেলের পদে আসিন হল। তারপর পরবর্তী চার বছর সে কোন মধ্যস্থতা ছাড়া পাকিস্তানের রাজত্ব করতে থাকে। ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী চৌধুরীর মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রথম আইন জারি করার পর ইসকান্দার মির্যা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় আর গভর্ণর প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। তার শাসনামলে আমেরিকান নির্দেশক সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে পঙ্গপালের মত ছেয়ে থাকে।

ইসকান্দার মির্যা তার গভর্ণরি ও প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে খুব ধুমধামে পাকিস্তান শাসন করে। নিজের মন মত মন্ত্রীদের নিয়ে আসে, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে, পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোকে মিটিয়ে দেয়। রিপাবলিকান পার্টি বানিয়ে পাকিস্তান নির্মাতা মুসলিম লীগের নাম-নিশানা পরিপূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়।

চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, হুসাইন সোহরাওয়ার্দি, আই আই চান্দ্রেগার ও ফিরোজ খান নুনকে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়েছে এবং তারপর পদচ্যুতও করা হয়েছে। এ সকল প্রধানমন্ত্রীরা একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে চলত, তাদের নিজেদের কোন মত চলত না।

হুসাইন সোহরাওয়ার্দির প্রধানমন্ত্রী বানানোর ব্যাপারে লেখিকা আয়েশা জালাল লিখেন: যখন তাকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হচ্ছে, তখন এই শর্তের ভিত্তিতে বানানো হয় যে, পশ্চিমাবান্ধব পররাষ্ট্রনীতি চালু রাখবে এবং সেনাবাহিনীর বিষয়াবলীতে হস্তক্ষেপ করবে না।

সর্বশেষে আমেরিকা বাহাদুরের ইচ্ছায় ইসকান্দার মির্যা আইয়ূব খানের সাথে মিলে মার্শাল ল' ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু এখনকার খেলা আইয়ূব খানের হাতে চলে আসে এবং সে ইসকান্দার মির্যাকে তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণ করে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়।

ইসকান্দার মির্যার ইসলাম ও শরীয়তের সাথে শত্রুতা

মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যার চিন্তা-চেতনা কারো নিকটই গোপন ছিল না। আমাদের সমস্ত দ্বীনদার শ্রেণী ও উলামায়ে কেরাম জানেন যে, এই ব্যক্তি কি পরিমাণ ইসলামের শত্রু ছিল। তার নির্দেশেই খতমে নবুওয়াতের কর্তৃপক্ষের উপর গণহত্যা চালানো হয়। সে-ই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভীত গেড়েছে এবং দেশাত্ববোধ মতবাদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে। এই ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবেই রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী থেকে ধর্মকে বের করার প্রবক্তা ছিল।

দায়েরায়ে মাআরেফ উইকিপিডিয়ার 'স্টোরি অফ পাকিস্তান' এ লেখা আছে:

মির্যার রাজনৈতিক দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও সব ধর্মের এক জাতীয়তা। যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল।

ইসকান্দার মির্যার সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ শিহাব নিজের আত্মজীবনীতেও একথা উল্লেখ করেছেন যে, ইসকান্দার মির্যার ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তিনি ১৯৫৬ সালের আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলেন:

২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যখন নতুন আইন কার্যকর করার সভা অনুষ্ঠিত হল, তখন ওই সময় দু'টি কুলক্ষণ দেখা দিয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে প্রচন্ড অন্ধকার ও তীব্র বৃষ্টি দেখা দেয়, যার কারণে

সামিয়ানার কিছু অংশ কয়েকজন মেহমানের উপর পড়ে যায়, যাদের মধ্যে এসেম্বলীর স্পিকার আব্দুল' ওয়াহহাব খানও ছিল।

দ্বিতীয় কুলক্ষণ হল, প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যার নিয়োগ। নতুন আইন ইসলামী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাহক ছিল । কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্টের এই দুই মূল্যবোধের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। নতুন আইনকে ইসকান্দার মির্যার প্রেসিডেন্টকালীন সময়ে কার্যকর করা ঠিক তেমন, যেমন বিড়ালের তত্ত্বধানে দুধ রাখা।

ইসকান্দার মির্যার সেক্রেটারী থেকে বেশি কে তাকে তার শাসনামলে দেখতে পারে। তার সাক্ষ্য দেখুন যে, এই ব্যক্তির ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। একজন এমন ব্যক্তি, যার ইসলামের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই, সে ইসলামের নামের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে এই দেশের হর্তাকর্তা হিসাবে থেকেছে। তাহলে তার থেকে কী আশা করা যায় যে, সে এখানে ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?!

এই ব্যক্তি পাকিস্তানে মদ, কাবাব ও নারী-পুরুষ সংস্কৃতি ব্যাপক করেছে এবং পশ্চিমা রীতিনীতি প্রসারে একটি মুহূর্তও নষ্ট করেনি। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ভবনেও এই সংস্কৃতিই চলত। ইসকান্দার মির্যার গভর্ণর জেনারেল ভবনের একটি

ঝলক স্বয়ং তারই সেক্রেটারীর ভাষায় লক্ষ্য করুন। এটা এই ব্যক্তির কুকর্মের প্রকাশ্য দলিল।

কী পরিমাণ আফসোসের বিষয় যে, পাকিস্তানের প্রথম দশ বছর রাজত্ব কি পরিমাণ হীন লোকদের হাতে ছিল। যাদের মধ্যে না আকিদা-বিশ্বাস মুসল'মানদের ছিল। না কার্যক্রম মুসল'মানদের ছিল। ইসলামের নামে কত বড় ঠাট্টা করা হচ্ছিল ইসলামকে নিয়ে। আমরা এখানে কুদরতুল্লাহ শিহাবের চয়নিকাটি উদ্ধৃত করব। কিন্তু তা থেকেও কিছু বাক্য বাদ দিয়ে.....। কারণ সেগুলো এতটা নিম্নমানের, যা বর্ণনা করাও আমাদের জন্য সম্ভব নয়। কুদরতুল্লাহ শিহাবের বর্ণনা:

মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যা ও বেগম নাহিদ মির্যা আসতেই গভর্ণর জেনারেল ভবনে দাওয়াত ও পার্টির কোর্স শুরু হয়ে যেত। কখনো ডিনার, কখনো ড্যান্স, কখনো মুনলাইট পিকনিক। একেক সময় একেকটি নতুন নতুন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত। যা রাত আট টা/সাড়ে আট টা বাজে শুরু হয়ে দেড়টা/দু'টা পর্যন্ত চল'ত। নারীদের জন্য তো এটা এক ধরণের ফ্যাশন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেদের শারিরীক সৌন্দর্য প্রদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের পোষাকের প্রদর্শনী করত।

কিছু নারীর এমন পোষাক পরিধানে দক্ষতা ছিল, যা দেহ ঢাকার পরিবর্তে তার চাকচিক্যের মাধ্যমে দেহকে উলঙ্গ করতে সাহায্য করত। মদের পেয়ালা ও সুরাপাত্রগুলোর কারিশমাও নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করত। এ সকল অনুষ্ঠানগুলোতে যে লোক ক্ষমতাবান হত, সে সম্পদশালী ব্যবসায়ী ও পেশাজীবিদের দিকে আফসোস ও হতাশার দৃষ্টি দিত। আর যাদের সম্পদের বাহার থাকত, তাদের মনে ক্ষমতাবানদের ব্যাপারে ঈর্ষা সৃষ্টি হত। আর যাদের নিকট সম্পদ ও ক্ষমতা উভয়টি থাকত, তাদের মনোতুষ্টির একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিল সুন্দরী নারী।

অত্যধিক মদপানের পর কিছু কিছু লোক খাবারের উপর গাধার ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ত। কিছু লোক গোসলখানায় গিয়ে বারবার বমি করত এবং নতুন উদ্যমে মদপান শুরু করত। আনন্দ-ফূর্তির এই আড্ডাগুলোতে মানবতা ক্ষীণ শ্বাস ছেড়ে বিদায়ের বার্তা জানাত। আর পাশবিকতা নতুন আকার ধারণ করত।

মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যা এটা ভাল করেই জানত যে, এ দেশের সাধারণ জনগণ ও মুসল'মানগণ এ দেশ অর্জনের জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ধ্বনি তুলেছিল এবং তাদের নিকট পাকিস্তান ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ জন্যই এ ব্যক্তি মুনাফেকী ও কপটতার পোষাক পরিধান করে পাকিস্তানে ইসলামের পরিবর্তে 'পাকিস্তানিয়্যাত ও দেশাত্ববোধ'এর আশ্রয় নিয়ে

নিজেকে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং জনগণের পাকিস্তানপ্রীতির ছায়ায় নিজের জন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করে।

ইসকান্দার মির্যা ১৯৫৫ সালে নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বলে: **আমরা পাগলদের মত ইসলামের পিছে দৌঁড়াতে পারব না। পাকিস্তান সবার আগে, পাকিস্তান সবার পরে।**

এই মতাদর্শই পরবর্তীরা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং নিজেদের ইসলাম ও শরীয়ত দুশমনীকে 'পাকিস্তানিয়্যাত'এর পর্দার নিচে আড়াল করেছে। আর ইসলামের প্রসার করার পরিবর্তে পাকিস্তানিয়্যাতের প্রসার ঘটিয়েছে। আজও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

জেনারেল আইয়ূব খান ও পাকিস্তানে প্রথম মার্শাল ল'

পাকিস্তানে ১৯৫৮ এর ১৭ ও ১৮ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে মির্যা ইসকান্দার ফিরোজ খান নুনের রাজত্ব শেষ করে দেয় এবং ১৯৫৬ সালের আইন অকার্যকর করে মার্শাল ল' লাগানোর ঘোষণা দেয় এবং চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রিটর বানায় জেনারেল আইয়ূব খানকে, আর নিজে পুরো দস্তর প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে। তা সত্ত্বেও ইসকান্দার মির্যা আর জেনারেল আইয়ূব খানের মাঝে কর্তৃত্বের লড়াইয়ে ইসকান্দার মির্যা হেরে যায় এবং আইয়ূব খান মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায়

২৭ অক্টোবর ইসকান্দার মির্যার প্রেসিডেন্টের পদ বাতিল করে নিজে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে।

ইসকান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ূব খানের এ সমগ্র খেলায় বৃটেন ও আমেরিকা তাদের সাথে ছিল। প্রকৃত কথা হল, এ সময় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শীতল যুদ্ধ চলছিল। আর আমেরিকার আশঙ্কা ছিল যে, পাছে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান রাশিয়ান ব্লকে শামিল হয়ে যায়। এই ভিত্তিতেই ইসকান্দার মির্যা ও জেনারেল আইয়ূব খান আমেরিকাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করে যে, যখন পাকিস্তানে ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে, তখন আর এ আশঙ্কা থাকবে না।

এই ভিত্তিতে এ দু'জন আমেরিকান আশির্বাদে পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি করে। পাকিস্তানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী আলতাফ গাওহার, যে ওই সময় প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ নূনের ডিপুটি সেক্রেটারী ছিল এবং তারপরে জেনারেল আইয়ূব খানের গোয়েন্দা সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োজিত থাকে, সে সাংবাদিক জাভেদ চৌধুরীকে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এই বাস্তবতাটি এই শব্দে ব্যক্ত করে:

ইসকান্দার মির্যা ফিরোজ খান নুন থেকে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্তও চুকে ফেলল। সে ৫৭ এর শেষ দিকে মার্শাল ল' জারি করতে চাইল। কিন্তু আমেরিকানরা

তাকে নিবৃত্ত করল। তারপর ১৯৫৮ সালে অর্থমন্ত্রী আমজাদ আলী শাহ ও জেনারেল আইয়ূব খান আমেরিকা গেল এবং আমেরিকান প্রশাসনকে বুঝাল যে, এখন পাকিস্তানে নির্বাচন দিবেন না। নইলে ভাষানী ও আব্দুল গাফফার খানের মত কমিউনিষ্ট নেতারা ক্ষমতায় এসে যাবে। পাকিস্তানে কেবল সেনা শাসনই আপনাদের জন্য উপকারী।

ফিরোজ খান নুনের দূর্ভাগ্য দেখুন, স্বয়ং তার অর্থমন্ত্রী ও কমান্ডার ইনচীফ আমেরিকায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আলোচনা করছে, কিন্তু তার খবরও নেই।

আইয়ূব খানের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি ছিল এবং তার মেয়াদ বৃদ্ধির খুব চিন্তা ছিল। রিটায়ার্মেন্টের সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল, আইয়ূব খান ততই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিল। তারপর প্রধানমন্ত্রী রাওয়ালপিন্ডির কোর্সে আসলে আইয়ূব খানের নিকট অবস্থান করল এবং আইয়ূব খানকে এক্সটেনশন দিয়ে গেল, যার মাত্র কয়েকদিন পরেই আইয়ূব খান আমেরিকানদের সাথে মিলে যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, তার মাঠ প্রস্তুত হয়ে গেল।

আইয়ূব খানের পরিচিতি

আইয়ূব খানের শাসনের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে তার পূর্ববর্তী জীবনের আলোচনা ও তার পরিচিতি বর্ণনা করা উপকারী হবে বলে মনে করি। যাতে

সম্মানিত পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, এই ব্যক্তিও নিজের পূর্বসূরীদের মত বৃটিশদের ঘনিষ্ট ও আস্থাভাজন ছিল এবং তার বংশধরও এ ধরণেরই ছিল।

আইয়ূব খানের ছেলে গাওহার আইয়ূব নিজ বই "গ্লিম্পস ইনটু দ্যা করিডোর ওফ পাওয়ার" এ নিজের বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখে:

একবার আমার পরদাদা খোদাদাদ খান ও আমার দাদা মিরদাদ খান বার্ষিক মেলা উপলক্ষে নূরপুর গিয়েছিলেন। এ সময় বৃটিশ ঘোরসওয়ার রেজিমেন্ট তাদের নিকট দিয়ে গেল, যারা নিজেদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পাল'নের জন্য বের হয়েছিল। ঘোড়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে পিতা-পুত্র দাঁড়িয়ে গেল। যুবক মিরদাদ খানের আকর্ষণ লক্ষ্য করে রেজিমেন্টের কমান্ডার তাকে ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করল। ফলে ১৮৮০ সালে মিরদাদ খান হাডসন ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। পরবর্তীতে তাকে রিসালদার মেজর পদ পর্যন্ত প্রমোশন দেওয়া হল। যা ওই সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বরাদ্দকৃত পদসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল যে, জেনারেল আইয়ূব খানের পিতাও ইংরেজদের নিমকখোর ছিল। ফলে ছেলেও একই আদর্শের উপর চলেছে এবং আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে রয়েল মিলিটারী কলেজ সান্ড্রাস্ট পর্যন্ত পৌঁছে। সান্ড্রাস্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ সালে সেকেন্ড

লেফটেনেন্ট হিসাবে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে ভর্তি হল। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বারমা সীমান্তে নিজের মুনিব বৃটেনের পক্ষে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করে এবং তারপর ১৯৪৭ সালে ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদদের মস্তক চূর্ণ করার জন্য নিয়োজিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে পূর্বপাকিস্তানের জি ও সি হিসাবে থাকে। বৃটিশদের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তাকে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেলের পদে উন্নতি দিয়ে জেনারেল ডিগলিস গ্রেসীর রিটায়ার্টের পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দেওয়া হয়। মজার বিষয় হল, ডিগলিস গ্রেসীর পরে মেজর জেনারেল ইফতেখার খানকে কমান্ডার ইনচিফ বানানোর কথা ছিল। কারণ সে বৃটেনের সবচেয়ে সুদৃষ্টির পাত্র ছিল। কিন্তু সে কোন এক ঘটনায় মারা গেল। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মধ্যে ফিরিঙ্গিদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিল জেনারেল আইয়ূব খান। এজন্য তাকে কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দেওয়া হয়। এই নির্বাচনের মধ্যে জেনারেল ইসকান্দার মির্যারও হাত ছিল।

জেনারেল আইয়ূব খানের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ

কমান্ডার ইনচিফ হওয়ার পর জেনারেল আইয়ূব খান রাজনৈতিক কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পরামর্শদাতাদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হয়। লিয়াকত আলী খানের হত্যার পরে যখন গভর্ণর জেনারেলের পদটি গোলাম মুহাম্মদের হাতে চলে আসে, তখন সে ইসকান্দার

মির্যার সাথে গোলাম মুহাম্মদের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে সে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী বুগেরাহর মন্ত্রীপরিষদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং একই পদে পরবর্তী চার বছর পর্যন্ত বহাল থাকে।

প্রকৃত কথা হল, ১৯৫১ সালের পরে পাকিস্তানী রাজনীতিতে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যার সাথে দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি আইয়ূব খান ছিল। এ সময়ই জেনারেল আইয়ূব খান সরকারী ও বেসরকারীভাবে আমেরিকা ও বৃটেনের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ চালিয়ে যায়। কুদরতুল্লাহ শিহাব লিখেছেন: ১৯৫৪ সালে আইয়ূব খান বৃটেনের কোর্সের মাঝেই নিজে ক্ষমতায় আসার পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলেছিল। যাকে চার বছর পর কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। এটাকে আইয়ূব খানের 'লন্ডন পালন'ও বলা হয়

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্যা মার্শাল ল' জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আইয়ূব খানের সরাসরি সরকারব্যবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জেনারেল আইয়ূব খান মার্শাল ল' জারি করে শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। দেশের প্রেসিডেন্টের মসনদ দখল করে এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে নিয়ে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে।

জেনারেল আইয়ূব খান ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই রাজনীতিকদের মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে এবদো আইন জারি করে এবং অধিকাংশ রাজনীতিবিদদেরকে

রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পার্লামেন্ট সিস্টেমকে প্রেসিডেন্সি সিস্টেমে রুপান্তরিত করে। রাজনীতিবিদদের বদনাম করার জন্য ষাট হাজার রাজনীতিবিদকে এবদোর মাধ্যমে অযোগ্য সাব্যস্ত করে, যাদের মধ্যে তেইশ হাজার রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক ছিল পূর্বপাকিস্তানের সাথে। প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডার জারি করে স্বাধীন সাংবাদিকতাকে শেষ করে দেয়। ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করে।

মার্শাল ল' এর সুবিধা ব্যবহার করে ক্রিপশন ও অযোগ্যতার অভিযোগ তুলে ১৩০০ সিভিল সার্ভেন্ট কর্মচারীকে বরখাস্ত করে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন এত বেশি বাড়িয়ে দেয়, যা জনগণের উপকরণাদি শামাল দিতে পারত না।

সবশেষে ১৯৬২ সালে জেনারেল আইয়ূব খান আইন জারি করে, প্রেসিডেন্সি পরিষদ ও পার্লামেন্ট বানায় এবং 'সীমিত গণতন্ত্র' এর দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র চালায়। দু'বছর পর ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্সি নির্বাচনের ধোয়া তুলে এবং তাতে ফাতেমা জিন্নাহকে সেনাবাহিনীর শক্তির মাধ্যমে হারিয়ে জেনারেল আইয়ূব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে। এই পাঁচ বছরে দেশের অবস্থা তথৈবচ হয়ে যায়। তাশখন্দ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে দখলকৃত এলাকাসমূহ ভারতকে ফিরিয়ে দেয় এবং কাশ্মীর নিয়ে সুদি জুয়া খেলে,

তখন পাকিস্তানের মুসলমানগণ জেনারেল আইয়ূব খানের প্রতি ক্রুদ্ধ ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

অপরদিকে এ সময় আইয়ূব খানের মানসিক অবস্থারও অবনতি হয়। তখন সে সময়ের কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল ইয়াহইয়া খান ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা বাহাদুরের ইশারায় ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেয়। জেনারেল ইয়াহইয়ার শাসনক্ষমতার ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে জেনারেল আইয়ূব খানের ইসলাম দুশমনী ও আমেরিকার গোলামী আলোচনা করা উপকারী হবে বলে মনে করি।

জেনারেল আইয়ূব খানের ইসলামের সাথে দুশমনী

গাওহার আইয়ূব, যে ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে ক্যাপ্টেন হিসাবে নিজের পিতা আইয়ূব খানের এ ডি সি হয়ে গিয়েছিল। সে ওই সময় নিজ পিতার পক্ষ থেকে যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের ব্যাপারে বলে:

অফিসারদের সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময়, বিশেষ করে 'অফিসার্স মেস' এর সামনে বক্তব্য দেওয়ার সময় পিতা শুধু সামরিক বিষয়ের উপর ক্ষান্ত থাকতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ অফিসারদেরকে বংশীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিজের জীবন উত্তমতর করার জন্য উপদেশ দিতেন। যে কারণে তাকে উলামা ও ধর্মীয়

শ্রেণীর পক্ষ থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে তার অবস্থানের কারণে সমালোচিতও হতে হয়েছে, যার মধ্যে একটি বংশীয় পরিকল্পনা প্রণয়নও ছিল। কিন্তু তিনি খুব কমই ওই লোকদের কথার প্রতি মনোযোগ দিতেন। আর তিনি তাদেরকে (দ্বীনদারশ্রেণীকে) নতুন বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়া ও প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ মনে করতেন।

আইয়ূব খান নিজের পূর্বসূরী ইসকান্দার মির্যার মতই ইসলামের দুশমন ও সেকুলার ছিল। তার দৃষ্টিতে রাজনৈতিক বিষয়াসয়ে ইসলামের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। এ জন্যই ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে যে পারিবারিক আইন জারি করে, তা ইসলাম ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তার বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরাম কঠিন আপত্তি করেছেন এবং এমন শাসকের কাফের হওয়ার ফাতওয়াও দিয়েছেন। এমনিভাবে জেনারেল আইয়ূব খান সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। অথচ ইসলাম সুদকে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছে।

শুধু এ পর্যন্তই নয়, জেনারেল আইয়ূব খান প্রথমে এই চেষ্টা করে যে, পাকিস্তানের "ইসলামী" ঐতিহ্যটি তুলে দেওয়া হবে এবং অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে এটা সরানোর আদেশও দিয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়ার কারণে তার নিকট ইসলামের রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরে

নিজের সেক্রেটারীর বারংবার অনুরোধের কারণে মুনাফিকী করে নিজের আদেশ প্রত্যাহার করে।

অনুমান করুন, জেনারেল আইয়ূব খান এই পরিমাণ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ছিল যে, যে দেশটি ইসলামের নামের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাত্র দশ বছর পরই তার থেকে ইসলামের ঐতিহ্যটি তুলে দিতে চেষ্টা করেছে। সম্ভবত: সে যদি এমনটা কার্যকরভাবেই করে ফেলত, তাহলে আমাদের জন্য আমাদের দ্বীনদার শ্রেণী ও সাধারণ লোকদেরকে বুঝানো সহজ হত যে, এই জেনারেল ও শাসকরা পাকিস্তানকে তার আসল উদ্দেশ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে। ফলে আমরা উঠে দাঁড়াতে পারতাম, নতুন আযাদী আন্দোলন শুরু করতাম এবং পাকিস্তানকে নতুন করে স্বাধীন করতাম। কিন্তু জেনারেলদের মুনাফিকী সেই কুফরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছে।

জেনারেল আইয়ূব খানের এই সেক্রেটারী ছিল কুদরতুল্লাহ শিহাব, যিনি নিজের আত্মজীবনীতে জেনারেল আইয়ূব খানের প্রাথমিক দিনগুলোর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

এই নতুন শাসনামলে কাজ শুরু করতেই আমার মনে এই খটকা সৃষ্টি হল যে, মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত যত সরকারী ঘোষণা, আইন ও রেজুলেশন জারি হয়েছে, তাতে শুধু পাকিস্তান সরকারের সূত্র দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। প্রথমে আমি চিন্তা করেছিলাম, হয়ত ড্রাফটিংয়ের মধ্যে সমস্যার কারণে দুয়েকবার ভুলে তা বাদ পড়েছে। কিন্তু যখন কিছুটা বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান চালালাম, তখন বুঝতে পারলাম যে, যে ব্যাপক ধারাবাহিকতার সাথে এই বাদ পড়ার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তা ভুলে হওয়ার সম্ভাবনা কম, ইচ্ছা করে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এ ব্যাপারে আমি একটি সংক্ষিপ্ত নোটে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের বরাবর আবেদন করি যে, তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আইন মন্ত্রণালয় ও মার্শাল ল' এর হেডকোয়ার্টারকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেই যে, এ পর্যন্ত জারিকৃত সমস্ত ঘোষণা ও আইনগুলোকে সংশোধন করুন এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল করবেন না।

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের নিয়ম ছিল যে, সে সকল ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র রোজকারটা রোজ সম্পন্ন করে আমার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিত। কিন্তু সাধারণ নিয়মের বিপরীতে এই ফাইল'টি কয়েকদিন পর্যন্ত আমার নিকট ফিরে আসল না। ৫ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা আমি দীর্ঘসময় পর্যন্ত দফতরে কাজ করছিলাম। বাহিরে বসে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব নিজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কোন একটি বিষয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করছিল। এক/দেড় ঘন্টা পর যখন সব লোক চলে গেল, তখন

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান কাগজটি হাতে নিয়ে আমার রুমে আসল। সে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের মাঝে ছিল।

এসেই আমার নোট আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল: তুমি ভুল বুঝেছ। ড্রাফটিংয়ে কোন ভুল হয়নি। আমরা চিন্তা-বুঝের মাধ্যমেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান থেকে ইসলামিক শব্দটি কেটে দিব।

এটা কি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, নাকি এখন করবেন?

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান কিছুটা রাগত স্বরে কঠিন ভাষায় আমাকে বলল: হ্যাঁ হ্যাঁ, ফায়সালা হয়ে গেছে। আগামী সকালের প্রথম জিনিসটার ড্রাফট পেতে চাই। তাতে যেন দেরি না হয়।

এতটুকু বলেই সে খোদা হাফেজ না বলে দ্রুত পদক্ষেপে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। আমার যদি হিম্মত হত, তাহলে আমিও তার পিছু পিছু ছুটতাম এবং তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে: ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান থেকে ইসলামী শব্দ মুছে ফেললে আপনি কী হন? কিন্তু এতটুকু সাহস আমার ছিল না। এজন্য আমিও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপচাপ নিজ ঘরে ফিরে আসলাম।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে সকালের কাছাকাছি সময়ে আমি প্রেস রিলিজ প্রস্তুত না করে বরং উহার স্থানে আমি আড়াই পৃষ্ঠার একটি নোট লিখলাম। যার সারকথা এই ছিল যে: পাকিস্তানকে ইসলাম থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এই

দেশের ইতিহাস পুরাতন, কিন্তু ভৌগলিক সীমা নতুন। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মাঝখানে রেডকাল্ব লাইন শুধু এজন্যই টানা হয়েছে যে, আমরা এই ভূখন্ড ইসলামের নামে অর্জন করেছি। এখন যদি পাকিস্তান থেকে ইসলামের নাম পৃথক করে দেওয়া হয়, তাহলে সীমান্তের এই রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এজন্য ইসলাম আমাদের নাজুক তবিয়তের নিকট পছন্দনীয় হোক বা না হোক, ইসলাম আমাদের জীবনাচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক, ব্যক্তিগত জীবনে আমরা ইসলামী অনুশাসনের আবদ্ধ হই বা না হই, সর্বাবস্থায় এটাই বাস্তবতা যে, যদি আখেরাতের জন্য নাও হয়, তবে এই কয়েক দিনের জীবনে নিজেদের স্বার্থে হলেও, নিজেদের দেশের নিরাপত্তার জন্য, আমাদেরকে ইসলামের ঢোল নিজেদের গলায় পড়ে জনগণের সামনে তা বাজাতেই হবে। চাই তার ভীতিকর ধ্বনি আমাদের কান সুখ যতই নষ্ট করুক না কেন।

আমি সময়ের পূর্বেই আমার অফিসে চলে আসলাম। ইচ্ছা ছিল, প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান আসার পূর্বেই আমার নোটটি টাইপ করে রাখব। কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে দেখি প্রেসিডেন্ট সাহেব পূর্বেই আসার জন্য পথ ধরেছেন। আমাকে দেখতেই কামরায় চলে আসল এবং জিজ্ঞেস করল: ড্রাফট প্রস্তুত তো? আমি উত্তর করলাম: প্রস্তুত তো বটে, তবে এখনো টাইপ করা হয়নি।

কোন সমস্যা নেই: সে বলল। ওই রকমই দেখাও।

সে আমার সামনে রাখা চেয়ারে বসে গেল এবং হস্তলিখিত নোটটি পড়তে লাগল। কয়েক লাইন পড়ে কিছুটা স্থান হারিয়ে ফেলল। তাই আবার নতুন করে পড়া শুরু করল। শেষ করার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর আস্তে বলল: তুমি সঠিক বলেছ। তারপর নোটটি হাতে নিয়ে কামরা থেকে চলে গেল। তারপর আর এ বিষয়ে কেউ কোন কথা বলেনি।

এই ঘটনা দ্বারা আইয়ূব খানের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু যখন তার নিজ সেক্রেটারীর পক্ষ থেকেই এমন উত্তরের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেক্রেটারীও এই পথ দেখিয়ে দেয় যে, যদি মন ও অন্তর নাও মানে, তথাপি কমপক্ষে মুনাফিকী করে হলেও এই ঐতিহ্য লাগিয়ে রাখতে হবে, তখন এই ভিত্তিতেই আইয়ূব খান মুনাফেকী হিসাবে এই ঐতিহ্যটি রেখে দিয়েছে।

এমনই আরেকটি ঘটনা, যা আইয়ূব খানের ধর্মহীনতার প্রমাণ দেয়, যা কুদরতুল্লাহ শিহাব আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন: যেদিন আইয়ূব খান প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করে, তখন সে আইন প্রণয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়ার ইচ্ছা করে। এর জন্য আইন কমিশনের সুপারিশ নেওয়া তার পছন্দনীয় নয়। ফলে সে নিজেই এ কাজ সেরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। এজন্য সে নিজেরই তত্ত্বাবধনে একটি কমিটি বানিয়ে আইন প্রণয়ন অধিবেশন ধারাবাহিকভাবে চালাতে লাগল।

একদিন আইয়ূব খান অভ্যাসমত নিজের রাজনৈতিক দর্শনের উপর একটি দীর্ঘ ভাষণ দিল। তখন একজন সিনিয়র অফিসার, যে মির্যার বংশধর ছিল, সে আনন্দের আতিশয্যে মাথা দুলাতে দুলাতে এবং বুকের উপর উভয় হাত রেখে অত্যন্ত বিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলতে লাগল: জনাব! আজ তো আপনার উচ্চ চিন্তা-ভাবনায় পয়গম্বরী ঝলক দেখা যাচ্ছিল'। (লা হওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।)

কুদরতুল্লাহ শিহাবের বক্তব্য অনুযায়ী এই প্রশংসার ট্যাক্স আদায় করার জন্য আইয়ূব খান খুবই নমনীয়তার সাথে মাথা ও ঘাড় ঝুকিয়ে দিল। কুদরতুল্লাহ শিহাবের প্রেসিডেন্টের আইয়ূব খানের এই অবস্থা দেখে আশঙ্কা জাগল, পাছে বাস্তবেই আইয়ূব খান উপরের দিকে উড়তে থাকে! (এবং পয়গম্ব হওয়ার হিম্মত করে বসে!), তাই সে মাঝখানে এসে আইয়ূব খানকে সম্বোধন করে এবং ওই মির্যায়ী অফিসারকে ভর্ৎসনা করে। তখন পরিস্থিতি বিগড়ে গেল। অবশেষে আইয়ূব খান ব্যাপারটি সমাধান করল।

জেনারেল আইয়ূব খান ও আমেরিকার গোলামী

জেনারেল আইয়ূব খান পাকিস্তানে আমেরিকার এক খাস ওফাদার ছিল। সে ক্ষমতায় আসার পূর্বে ও পরে আমেরিকার খুবই ওফাদারী করে। কুদরতুল্লাহ শিহাব লিখেন:

ক্ষমতায় আসার অনেক পূর্বেই আইয়ূব খান সাহেব আমেরিকা পূজার আন্তর্জাতিক ফ্যাশনেবল রোগে আক্রান্ত ছিল। বড় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ হওয়ার সুবাদে সে আমেরিকান সেনা হেডকোয়ার্টার পেন্টাগনের সাথে অত্যন্ত গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল। অতঃপর আমেরিকান সেনাকমান্ডারদের তত্ত্বধানে এবং তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের কমান্ডার ইনচিফ নিজের সেনাবাহিনীকেও সেভাবেই বিন্যস্ত, সুসজ্জিত ও স্বশস্ত্র করা শুরু করে দিল, যার কারণে পরবর্তীতে আমেরিকান ফৌজের সাহায্য ব্যতিত আমাদের সেনাবাহিনীর নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা বিকল্প প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করা পরিপূর্ণ অসম্ভব হয়ে গেল।

জেনারেল আইয়ূব খান ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে সিভিল সরকারের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামত আমেরিকান কোর্সে যোগ দেয়। অথচ পাকিস্তানের সিভিল সরকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকায় কোর্স করার নির্দিষ্ট সূচি করে দিয়েছে।

আইয়ূব খান উপযুক্ত মূল্যের ভিত্তিতে এমন একটি লেনদেন করার চেষ্টা করে, যার মাধ্যমে পাকিস্তান পশ্চিমা জোটভূক্ত দেশের ভূমিকা পালন করতে পারে। আর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আইজন হাওর কোরিয়া থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও ইরাকের মত সামনের সারির দেশগুলোকে সামরিক

যোগ্যতা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেয়, যার উদ্দেশ্য রাশিয়ার চতুর্পাশে একটি মজবুত অবরোধ তৈরী করা।

শিরী তাহির খাইলী "দি ইউনাইটেড স্টেট এন্ড পাকিস্তান" নামক বইয়ে লিখেন: আমেরিকান সাহায্য লাভের জন্য আইয়ূব খান এতটা সীমালঙ্ঘন করল যে, সে আমেরিকান কর্মকর্তাদেরকে বলল: আপনারা চাইলে আমাদের আর্মিই আপনাদের আর্মি হতে পারে। শর্ত হল, উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

জেনারেল আইয়ূব খান এই অঞ্চলে আমেরিকান স্বার্থের সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ছিল। সে এমন প্রতিটি পদক্ষেপের পরিপূর্ণ বিরোধিতা করেছে, যার মাধ্যমে আমেরিকান সাহায্য কমানোর চেষ্টা করা হত।

১৯৫৮ সালের আগস্টে যখন স্টেট ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুল কাদির খান সরকারকে পরামর্শ দেয় যে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষা বাজেট ও আমেরিকী এড কমানো উচিত, তখন জেনারেল আইয়ূব খান প্রধানমন্ত্রী বরাবর পত্র লিখে স্টেট ব্যাংকের গভর্ণরের বিরুদ্ধে শক্তভাষা ব্যবহার করে এবং তার অপছন্দনীয় কর্মকান্ড বন্ধ রাখার পরামর্শ দেয়।

জেনারেল আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে কার্যগতভাবে এবং চিন্তাগতভাবে আমেরিকান সেনাবাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। অতঃপর আমেরিকা নিজ পছন্দ ও স্বার্থ অনুযায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী থেকে

কাজ নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব আমেরিকা প্রীতির কারণে সেনাবাহিনীর কাঠামোই পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমেরিকান প্রশিক্ষণ ও কৌশলের সাথে সাথে আমেরিকান চিন্তাধারাও সেনাবাহিনীকে শিখিয়েছে।

দায়েরায়ে মাআরিফ উইকিপিডিয়ায় আইয়ূব খানের শাসনামলের ব্যাপারে লেখা হয়েছে:

আইয়ূব খানও নিজের পূর্বপুরুষদের ন্যায় শীতল যুদ্ধে আমেরিকার সাথে ঐক্যের পলিসি বহাল রেখেছে। সিনেটে অন্তর্ভুক্ত থেকেছে। আমেরিকা ও বৃটেনকে পাকিস্তানী সুবিধাজনক এলাকাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষকরে পেশোয়ারের বাইরে বিদ্যমান এয়ার ভাইস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যেখান থেকে সেভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান উড়ানো হত।

একথা কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে যে, আইয়ূব খান আমেরিকার কর্মচারী ছিল। কমান্ডার ইনচিফ থাকার সময় আইয়ূব খান স্বতন্ত্রভাবে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং আমেরিকান দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খলা সাজিয়েছে। আমেরিকার ইচ্ছাতেই রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছে এবং পরে আমেরিকার ইচ্ছায়ই রাজত্ব করা শুরু করেছে। এটা এমন এক বাস্তবতা, আপন-পর সবাই যার স্বীকৃতি দেয়।

সে মুনাফিকী পন্থা অবলম্বন করেই নিজের বইয়ের শিরোনাম বাছাই করেছে: 'ফ্রেন্ডস নট মাষ্টার'। এর মাধ্যমে সে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে, সে আমেরিকাকে নিজের বন্ধু হিসাবে রাখতে চেয়েছে। নিজের মনিব বানাতে চায়নি। সে নিজের বইয়ে তার ঐ সমস্ত কর্মকান্ডের কোনই উল্লেখ করেনি, যার মাধ্যমে আমেরিকান শাসকশ্রেণী, বড় বড় পদধারী ও দূতদের সাথে বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক প্রকাশ হয়। কিন্তু তার এই হাকিকত তার পারসোনাল সেক্রেটারী কুদরতুল্লাহ শিহাব, গোয়েন্দা সেক্রেটারী আলতাফ গাওহার ও অন্যান্য লেখকগণ খোলা ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

আর একথাও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে যে, আইয়ূব খান সেক্যুলারিজমের এক আদর্শপুরুষ, যার প্রতিবিম্ব তার পরবর্তী পাকিস্তানী সেনাবাহিনী-প্রধানদের মাঝেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ও হবে। এই বাস্তবতা থেকে চোখ বুজে থাকা নিজেকে ধোঁকা দেওয়া ব্যতিত কিছুই নয়।

জেনারেল আগা ইয়াহইয়া খানের শাসন

যখন আইয়ূব খান নিজ আয়ু পুরা করে ফেলল এবং আমেরিকানরা তার দ্বারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে ফেলল, তখন আমেরিকানরা চাইল, তার জায়াগায় তার স্থলাভিষিক্ত ইয়াহইয়া খান ক্ষমতার লাগাম হাতে নিক। ফলে আইয়ূব খানের জীবনের শেষ সময়ে জেনারেল ইয়াহইয়া খান রাজনৈতিক অচলাবস্থাগুলোতে

পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষকরে পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে নিজের কূটচাল দ্বারা আরো বেশি ঘোলাটে করে। যাতে আইয়ূব খানের জন্য সবকিছু জেনারেল ইয়াহইয়ার হাতে সোপর্দ করে নিজে ক্ষমতা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যতিত কোন অপশনই অবশিষ্ট না থাকে।

আলতাফ গাওহার, যে আইয়ূব খানের আমলে গোয়েন্দা সেক্রেটারী ছিল, সে বর্ণনা করে:

আমেরিকানদের জন্যও আইয়ূব খানকে নিস্ক্রীয় করার এটা মোক্ষম সুযোগ ছিল। তারা ইয়াহইয়া খানের দৌরাত্ম বাড়িয়ে দিল। ইয়াহইয়া খান সকল ক্ষমতা নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে শুরু করল। মন্ত্রীরাও সেনাবাহিনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিল। ওই সময় ইয়াহইয়া খান সর্বশেষ আঘাত হানার জন্য আওয়ামী ইজিটেশনের দৌরাত্ম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল।

যখন প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহইয়া খানকে কমান্ডার ইনচিফ বানিয়ে দিল, তখন তার প্রেসিডেন্ট থেকেও বেশি ক্ষমতা হয়ে গেল এবং সর্বশেষে সেই কর্তৃত্বের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানকে ক্ষমতা থেকে পৃথক করে দেয়। আলতাফ গাওহার শেষ সময়গুলোর ব্যাপারে বলে:

একবার করাচি, ঢাকা ও লাহোরে আংশিক মার্শাল ল' জারি করার সিদ্ধান্ত হল। আইয়ূব খান ইয়াহইয়াকে মন্ত্রীপরিষদে ডেকে পাঠাল। তখন ইয়াহইয়া আংশিক মার্শাল ল' জারি করতে পরিপূর্ণ অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল এবং অবস্থা ঠিক তেমনই হয়ে গেল, যেমন ইসকান্দার মির্যার আইয়ূব খানের সামনে হয়েছিল।

"নিশ্চয়ই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।"

তারপর ইয়াহইয়া আইয়ূব খানকে বলল: "বিরোধীরা ক্ষমতায় এসে আপনাকে হটানোর পরিকল্পনা করছে। আপনি যদি আমাকে সুযোগ দেন, তাহলে আমি সবাইকে সোজা করে ফেলব। ভুট্টো ষড়যন্ত্র করেছে, মুজিব ষড়যন্ত্র করেছে। সবাইকে ছুটি দিয়ে দিব। আইয়ূব খান কথায় এসে গেল। ইয়াহইয়া খান তাকে পরামর্শ দিল: আপনি তিন মাসের জন্য ছুটিতে চলে যান আর আমাকে একটি পত্র লিখে দেন যে, কমান্ডার ইনচিফ তার আইনী দায়িত্ব পালন করবে।"

আইয়ূব খান আমাকে ডেকে চিঠির ড্রাফট তৈরী করার নির্দেশ দিল। আমি পত্র দেওয়ার জন্য তার দফতরে গেলে সে আমাকে বলল: তুমি এটা বুঝ না যে, আমি সরে পড়ব। আমি ইয়াহইয়াকে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি। সাথে সাথেই ফাইলটি খুলে সে পড়তে লাগল, যা সে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কমান্ডার ইনচিফকে দিয়েছিল।

এ সময় এ ডি সি ভিতরে এসে ইয়াহইয়া খানের আগমনের সংবাদ দিল। আইয়ূব খান আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। তারপর ইয়াহইয়া খান চিঠির ড্রাফট দেখল এবং তা মনজুর করে নিল। আইয়ূব খান ধারণাও করতে পারেনি যে, ইয়াহইয়া খান চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই সন্ধাবেলা মার্শাল ল' জারি করে আইন খতম করে দিবে এবং সমস্ত শক্তি নিজের হাতে নিয়ে নিবে। মার্শাল ল' লাগানোর পর আইয়ূব খান মাত্র দু'দিন প্রেসিডেন্ট ভবনে অবস্থান করেছে।

এ বিষয়টি এতটা স্পষ্ট যে, আলতাফ গাওহার ছাড়া আইয়ূব খানের পুত্র গাওহার আইয়ূবও নিজের বইয়ে জেনারেল ইয়াহইয়া খানের সেই ভূমিকার কিছুটা আলোচনা করেছে। গাওহার আইয়ূব লিখেছে: প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়ার কারণে কঠিন রোগে আক্রান্ত হল, তখন সে চাইল প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা হবে জাতীয় এসেম্বলীর স্পীকারকে। যে পদে সে সময় গাওহার আইয়ূব ছিল।

যখন গাওহার আইয়ূব একথা জি এইচ কিউ এর মধ্যে ইয়াহইয়া খানকে বলল, তখন সে (ইয়াহইয়া খান) কঠিনভাবে তা খন্ডন করল এবং এমনটা হতে দিল না। বরং জেনারেল ইয়াহইয়ার বলার কারণেই প্রেসিডেন্টের হালকা অসুস্থতাকে বাহানা বানানো হয় এবং রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম অঘোষিতভাবে ইয়াহইয়ার ইচ্ছামত চলতে থাকে।

যখন আইয়ূব খানের একের পর এক পীড়া বাড়তেই লাগল এবং সে সরকারী কার্যাবলীর উপযুক্তই রইল না, তখন জেনারেল ইয়াহইয়া প্রকাশ্যই সব দায়-দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিল। এ বিষয়ে গাওহার আইয়ূব লিখে:

যখন সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, আমার পিতার দিন শেষ হয়ে গেছে, তখন জেনারেল ইয়াহইয়া নিজের আশপাশের জেনারেলদেরকে আগানো পিছানো শুরু করে দিল। তার নিকটাত্মীয় অফিসারদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দিয়ে দিল। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার খাহেশ তার মাঝে এতটাই প্রকাশ্য ছিল যে, হংকংয়ের কোর্সের সময় যখন জেনারেল ইয়াহইয়া খানকে ডিনারের সময় কেউ একজন জিজ্ঞেস করল যে: আইয়ূব খানের পরে দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবে? তখন একটুও কালক্ষেপণ না করে ইয়াহইয়া খান জবাব দিল: ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট আপনার সামনেই দাড়ানো!

একটু সামনে গিয়ে গাওহার আইয়ূব নিজ পিতার সেই কথা আলোচনা করেন, যা আমাদের এ পুরো আলোচ্য বিষয়ের জন্য স্পষ্ট দলিল। অর্থাৎ এই দেশ মূলত: জেনারেলদের নিয়ন্ত্রণে। তারা যেমন চায় করতে পারে। গাওহার আইয়ূব লিখে:

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডি আই জি করাচি এ এনট্রেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল: সে জেনারেল ইয়াহইয়ার করাচির কোর্সগুলোতে তার অনুসরণ করছে এবং সে বুঝতে পারছে যে, সামরিক বিপ্লবের জন্য মাঠ প্রস্তুত করা হয়ে গেছে। এ

এনট্রেন ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, সে আইয়ূব খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। গাওহার আইয়ূব তাকে আইয়ূব খানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। সাক্ষাতের পর যখন গাওহার আইয়ূব; আইয়ূব খানকে বলল: যদি এই পুলিশ অফিসারের কথার মধ্যে সত্যতা থাকে, তাহলে জেনারেল ইয়াহইয়ার কর্মকান্ডের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা উচিত। তার জবাবে আইয়ূব খান সমর্থন করল বটে, কিন্তু তারপর বলল:

তুমি জি এইচ কিউ এর মধ্যে চাকুরী করেছ। তোমার জানা উচিত যে, যখন পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার ইনচিফ নিজ মস্তিস্কে শাসনক্ষমতা দখলের ইচ্ছা করে ফেলে, তখন আল্লাহ ব্যতিত দ্বিতীয় কেউ তাকে এ কাজ থেকে ঠেকাতে পারে না।

এ সমস্ত কাজগুলোকে আমেরিকান একনায়নতন্ত্র না বললেও তাদের ইঙ্গিতে যে হচ্ছে, তা তো অবশ্যই বলবেন। তার সাক্ষ্য যেমনিভাবে উপরে বর্ণিত আলতাফ গাওহার দিয়েছে, তেমনি কুদরতুল্লাহ শিহাবও দিয়েছে। সে উল্লেখ করেছে যে, ওই সময়গুলোতে পাকিস্তানে আমেরিকার পক্ষ থেকে দূত হিসাবে মিষ্টার ওয়েলহার্ট নিয়োজিত ছিল। যে শেষ দিনগুলোতে আইয়ূব খান অসুস্থতার কারণে জেনারেল ইয়াহইয়া খানের সোপর্দ ছিল, এ সময় জেনারেল ইয়াহইয়ার সাথে এই ওয়েলহার্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং জেনারেল ইয়াহইয়ার মার্শাল ল' লাগানোর ছয় দিন পূর্বে ১৯ মার্চ তাৎক্ষণিকভাবে মিষ্টার ওয়েলহার্ট আমেরিকার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হয়ে যায়। যাতে জেনারেল ইয়াহইয়ার মার্শাল ল' এর জন্য স্বীকৃতির মোহর সুদৃঢ় করতে পারে।

আগা ইয়াহইয়া খানের পরিচিতি

জেনারেল ইয়াহইয়ার জীবনটিই বৃটেন ও আমেরিকার গোলামীর প্রতিচ্ছবি ছিল। সে নিজের পুরো সেনা চাকুরীতে আমেরিকা ও বৃটেনের চর ছিল। জেনারেল ইয়াহইয়া খানও আইয়ূব খানের মত রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার ছিল। যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের পক্ষে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে এবং পুরো যুদ্ধে তিনটি স্থানে (ইরাক, ইটালী ও উত্তর আফ্রিকায়) লড়াই করেছে। সে এই যুদ্ধের মাঝেই ১৯৪২ সালের জুনে উত্তর আফ্রিকায় গ্রেফতারও হয় এবং পরবর্তীতে ইটালীর বন্দীক্যাম্প থেকে পলায়ন করতে সফল হয়। নিজের অবদান এবং আমেরিকা ও বৃটেনের গোলামির কারণে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে বিগ্রেডিয়ার পদে প্রমোশন লাভ করে। উইকিপিডিয়ায় তার ব্যাপারে লেখা হয়েছে: বৃটেন ও আমেরিকার প্রতি চূড়ান্ত অনুগত থাকার কারণে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তাকে বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নতি দান করা হয়।

এ বাক্য দ্বারা খুব ভালভাবেই অনুমান করা যায় যে, জেনারেল ইয়াহইয়া তার চাকুরী জীবনে কী পরিমাণ গোলামীর ভূমিকা পালন করেছে এবং এই ভূমিকার কারণেই আমেরিকার চাপ ও নির্দেশে আইয়ূব খান জেনারেল ইয়াহইয়াকে নিজের

শাসনামলে প্রমোশন দিয়েছে এবং সর্বশেষে ১৯৬৬ সালের মার্চে কমান্ডার ইনচিফ নির্ধারণ করে। আমেরিকার গোলামির সাথে সাথে দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও জেনারেল ইয়াহইয়ার ভূমিকায় ছিল। তা হল, সে পুরো দুনিয়ায় ওই সময়ও মদ্যপ, ব্যভিচারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল। তাকে হার্ড ড্রিংকিং সোল'জার বলা হত। নিজ চিন্তা-চেতনায়ও সে চূড়ান্ত মাত্রার ধর্মহীন ছিল। যার ইসলাম নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। সে আইয়ূব খানের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে আমেরিকানদের মত ঢেলে সাজাতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

জেনারেল ইয়াহইয়া খানের শাসনকাল

জেনারেল ইয়াহইয়া শাসনক্ষমতার লাগাম হাতে নিতেই মার্শাল ল' জারি করেছে। এসেম্বলী ও জাতীয় মন্ত্রীপরিষদ অকার্যকর করে দেয় এবং সমস্ত সরকার-ব্যবস্থা চারজন সেনা কমান্ডারের মাঝে ভাগাভাগি করে নেয়:

১. জেনারেল ইয়াহইয়া খান। দেশের প্রেসিডেন্ট। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর। গোয়েন্দাবিভাগ, আইন বিভাগ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব।

২. লেফটেনেন্ট জেনারেল আব্দুল হামিদ খান। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব।

৩. ভাইস এডমিরাল সাইয়্যিদ মুহাম্মদ। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধান। অর্থ, পরিকল্পনা কমিশন, কমার্স ও কারিগরি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব।

৪. এয়ার মার্শাল নুর খান। চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধান, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব।

পরিপূর্ণ জেনারেলী শাসন ছিল। যার মধ্যে সমস্ত সরকারী কার্যক্রম নিরেট সামরিক সিস্টেমে পরিচালিত হত। আর সরকারী ফায়াসালার বিপরীতে আদাল'তে আপিল' শোনার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। যখন ১৯৭০ এ সাধারণ নির্বাচন হল, তার ফলাফলের ক্ষেত্রেও পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী উপসাগরকে দুর্গম করে তুলল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি জেনারেল ইয়াহইয়ার নাগালের বাইরে চলে যেতে লাগল, তখন সে পূর্বপাকিস্তানে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

জেনারেল ইয়াহইয়া ও বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর গণহত্যা

জেনারেল ইয়াহইয়া পূর্বপাকিস্তানে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ এর মার্চে অপারেশন সার্চ লাইট নামে সামরিক অভিযান শুরু করে দেয়। যার মধ্যে তিন লাখের মত বাঙ্গালী মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং হাজারো বাঙ্গালী বোনদের

সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়। আজও পর্যন্ত জেনারেলদের একই নীতি চলছে যে, সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের রক্তের হোলি খেলা হয়।

সেনাবাহিনীর এই আচরণের কারণে ভারত মজলুম বাঙ্গালীদেরকে সাহায্য করে এবং দেখতে দেখতেই বাঙ্গালীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করে দেয়। তারপর স্বয়ং ভারতও যুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। নয় মাসের ভেতরেই ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নব্বই হাজার সৈন্যসহ ভারতীয় সৈন্যদের সামনে অস্ত্র ফেলে নিকৃষ্ট পরাজয় বরণ করে এবং পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে যায়।

বাঙ্গালী মুসলিমদের উপর নির্যাতনের এই কাহিনী এতই লোমহর্ষক যে, তার ব্যাপারে লিখতেও কলম কেঁপে উঠে। কিভাবে নিরস্ত্র বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে স্বশস্ত্র সৈন্যরা গুলি করেছে এবং কিভাবে বাঙ্গালী বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় "হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট" এই ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। বরং সেখানে বর্ণিত সংখ্যা ও পরিসংখ্যানও প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অনেক কম।

এ সব জেনারেল ইয়াহইয়ার কীর্তি ছিল। এ সকল কীর্তি এর ভিত্তিতেই হয়েছে যে, সেনাবাহিনীর জেনারেলরা নিজেদেরকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিটি বস্তুর মালিক মনে করে। তারা যা চাইবে, তাই করবে। কোন জিজ্ঞেসকারী নেই। যখন

জেনারেল ইয়াহইয়া দেখল যে, দেশের এই অবস্থা হয়েছে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং নিজে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে পড়ে।

ভুট্টো তাকে নজরবন্দি করে রাখে এবং জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত সে নজরবন্দি জীবনই অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু সেই জেনারেল জিয়াউল হক, যে মাত্র একটি হত্যার ভিত্তিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, সে লাখো মুসলমানের গণহত্যা সত্ত্বেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নিমকহালালী করার জন্য জেনারেল ইয়াহইয়াকে সসম্মানে মুক্ত করে দেয়।

জুলফিকার আলী ভুট্টো ও কমান্ডার ইনচিফ জেনারেল গুল হাসান

পাকিস্তান দু'ভাগ করার পর যখন পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, তখন তাৎক্ষণিকভাবে জেনারেল ইয়াহইয়া খান ক্ষমতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে হস্তান্তর করে দেয়। ভুট্টো প্রথম সিভিলাইন মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যায়। ভুট্টো, যে ইসকান্দার মির্যার বেগম নাহিদার মধ্যস্থতায় পাকিস্তানী রাজনীতিতে জড়িত হয়, সে সেনাবাহিনীর ছায়ায়ই রাজনীতির অংশ হয়। বিশেষত: জেনারেল আইয়ূব খান তাকে নিজের মন্ত্রীপরিষদের সদস্য বানায় এবং সে আইয়ুবের শাসনামলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে। ওই যুগের

মৌলিক ঘটনাগুলোতে ভুট্টোও সামনে সামনে থাকে এবং পূর্বপাকিস্তান পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে ভুট্টোরও মৌলিক ভূমিকা ছিল। পাকিস্তানের ব্যাপারে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে তাকে দেশের প্রধান বানিয়ে দেওয়া হয়।

ভুট্টোকে প্রধান বানানোর ক্ষেত্রেও মৌলিক ভূমিকা জেনারেলদেরই ছিল। জেনারেল ইয়াহইয়ার সাথে অপর সিনিয়র অফিসার ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, যে মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এর দ্বিতীয় প্রধানও ছিল। এদের উভয়কে পূর্বপাকিস্তান ভাঙ্গার কারণে, জনসাধারণ ও স্বয়ং সেনাসদস্যদের ঘৃণার কারণে সরকার ও সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হতে হয়েছে। তারপর সর্বোচ্চ সিনিয়র অফিসার ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল গুল হাসান, যে জেনারেল ইয়াহইয়ার পরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ হয়েছে। জেনারেল গুল হাসানের ইচ্ছায়ই ক্ষমতা ভুট্টোর হাতে স্থানান্তরিত হয় এবং তার চিন্তা-ভাবনা এই ছিল যে, ১৯৭১ এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর যেহেতু দেশে সেনাবাহিনীর ভাব-গাম্ভীর্য দারূণভাবে আহত হয়েছে এবং সেনা জওয়ান ও জনসাধারণের মাঝে জেনারেলদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। এর ভিত্তিতে জেনারেল গুল হাসান সিদ্ধান্ত নিল যে, কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা ভুট্টোর হস্তান্তর করে দেওয়া

হবে এবং উপযুক্ত সময় দেখলে পুনরায় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে নিয়ে এসে মার্শাল ল' লাগানো হবে।

ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী, যে সে সময় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠান-আই এস পি আর এর প্রধান ছিল, সে নিজ বই "ইস্ট পাকিস্তান: দি ইন্ড গেম" এর মধ্যে এ পর্যন্ত লিখেছে যে, জেনারেল গুল হাসান এয়ার মার্শাল রহিম খানকে বলল: "আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাদের নিকট এই জুকার ভুট্টোকে সুযোগ দেওয়া ব্যতিত কোন উপায় থাকবে না। পরিশেষে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান।"

এ বাক্যটি দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, ভুট্টোর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ফায়াসালা সেনাবাহিনীর প্রধানরা করছে এবং পরে এই সেনাবাহিনীই ভুট্টোর উপর বিশেষ নজরদারিও করতে থাকে। স্বয়ং ভুট্টোর কথা অনুযায়ীই জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম ফায়াসালা করেছিল যে, তারা দু'বছর অপেক্ষা করবে এবং তারপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর অধীনে চলে যাবে।

কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা দেখে জেনারেল গুল হাসান দু'মাসের বেশি অপেক্ষা করতে চাচ্ছিল না। ব্যস, এবার ভুট্টোই সামনে বেড়ে জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম খান উভয়কে পদ থেকে অপসারণ করে এবং জেনারেল গুল হাসানের স্থানে নিজের সমমনা জেনারেল টিক্কা খানকে সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান বানায়। সে-ই সেনাবাহিনীর একমাত্র প্রধান, যে লেফটওয়েং এর চিন্তা-চেতনা

গ্রহণ করেছে। ভুট্টোর মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রিটায়ার্ট হওয়ার পর ভুট্টোর "পাকিস্তান পিপলস পার্টি" এর নিয়মিত রুকন এর পদ গ্রহণ করে। ফলে তার মাধ্যমে ভুট্টো পাঁচ বছর শাসন করে।

এটা সে সময় ছিল, যখন আমেরিকার সাহায্যে সেনাবাহিনীর গোপন প্রতিষ্ঠান আই এস আইকে শক্তিশালী করা হয়। ওই সময় আই এস আই এর প্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল গোলাম জিলানী খান ছিল। এই ব্যক্তি আমেরিকার খাস খাদেম ছিল। জেনারেল টিক্কা খান থেকে নিরাশ হয়ে আমেরিকা এই জেনারেল গোলাম জিলানীর মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। ভুট্টোর শেষ সময়ে অনেক রাষ্ট্রীয় কায়-কারবারে এই জেনারেলের প্রভাব ছিল। তার চাপেই ভুট্টো টিক্কাখানের পরে ১৯৭২ এর মার্চে জেনারেল জিয়াউল হককে সেনাবাহিনীর প্রধান বানিয়েছে। অথচ জেনারেল টিক্কা খান এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। তারপর এই জেনারেল গোলাম জিলানী খানের সাহায্যেই জেনারেল জিয়াউল হক এক বছর পরে ১৯৭৭ সালের জুলাই এ মার্শাল ল' লাগিয়ে ক্ষমতার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং ভুট্টো ও জেনারেল টিক্কা খান উভয়কে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

জেনারেল জিয়াউল হকের শাসন

জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালের জুলাই এ ক্ষমতা গ্রহণ করেই পাকিস্তানে সব ধরণের রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপর মামলা মুকাদ্দামা চালিয়ে দুই বছরের মধ্যে তাকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কিন্তু এবার জেনারেল জিয়াউল হক নতুন রূপ ধারণ করে।

এটা সে সময় ছিল, যখন বিগত ত্রিশ বছরের কর্মকান্ড দেখে পাকিস্তানের দ্বীনদার শ্রেণীর মাঝে ভীষণ ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। সেই দ্বীনদার শ্রেণী, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কুরবানী দিয়েছিল। তাদের কুরবানীগুলো ফলপ্রসু প্রমাণিত হল না। বরং পাকিস্তানের ত্রিশ বছরে তাকে ইসলাম থেকে দূরে এবং ধর্মহীনতার রাস্তায় চালানো হয়েছে। এজন্য জেনারেল জিয়াউল হক সেনাশাসনের সাথে সাথে তাকে ইসলামী রং দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। যাতে রাজনীতিবিদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতারণা হিসাবে দ্বীনদার শ্রেণীকে নিজের সাথে ভিড়াতে পারে এবং তাদের শক্তিতে সেনা শাসন কায়েম রাখতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে জেনারেল জিয়াউল হক নিজের পূর্বসূরীদের থেকে একটুও ভিন্ন ছিল না। যদি কিছুটা ভিন্ন থেকে থাকে, তাহলে তা এদিক থেকে যে, সে মুনাফিকীর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর ছিল। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৭ সালের জুলাই থেকে নিয়ে ১৯৮৮ এর আগষ্ট পর্যন্ত পুরো এগার বছর পাকিস্তানের শাসন পরিচালনা

করেছে। ফজলে এলাহির পরে ১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বরে জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। এ সময় জেনারেল জিয়া তিনটি পদ নিজের কাছে রাখে:

১. দেশের প্রধান

২. চিফ অফ আর্মি স্টাফ

৩. মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর।

জেনারেল জিয়াউল হক তার শাসনামলে বেশিরভাগ পদগুলো সেনাবাহিনীর জেনারেলদেরকেই দেয় এবং জেনারেলী আদলেই হুকুমত চালাতে থাকে। রাজনীতিবিদদের দেশে মর্যাদাই ছিল না। বরং সে রাজনীতিবিদদেরকে গাধা বলত। তার শাসনের মৌলিক ভিত্তিগুলোর মধ্যে ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল ইয়াকুব খান। যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার শাসনামলে পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত ছিল। আর আকিদার দিক থেকে ইসমাঈলীয়া শিয়া ছিল। দ্বিতীয়জন ছিল লেফটেনেন্ট জেনারেল এম আরিফ, যে জিয়ার নায়েব ছিল। সেও ইয়াহইয়ার আমলে পূর্বপাকিস্তানের উপরোল্লেখিত জেনারেল ইয়াকুব খানের সাথে সরকারের খেদমত করেছিল। এ দু'জনের সাহচর্য জিয়ার শাসনকে শক্তিশালী করেছে।

নিজের পছন্দমত লোকদেরকে নিজের পরামর্শদাতা বানানোর জন্য জিয়াউল হক পার্লামেন্টের স্থলে মজলিসে শূরার নামে আইন পরিষদ বানায়। তার একটি

উদ্দেশ্য হল, নিজের সকল কার্যাবলীর উপর ইসলামী রং লাগানো। নওয়াজ শরীফ এই জিয়ার শাসনামলেরই সৃষ্টি, যেহেতু সে তার মজলিসে শূরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের ধোঁকা দিয়ে নিজের পছন্দমত প্রধানমন্ত্রী বানায় মুহাম্মদ খান জুনিজোকে। আর মার্শাল ল' উঠিয়ে দেয়।

কিন্তু সমস্ত কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের কাছেই থাকে। তিন বছর জুনিজো জিয়ার ছত্রছায়ায় শাসন করে, যার মধ্যে সে কিছুটা গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন জিয়ার সাথে জুনিজোর রাজত্বের কষাকষি হতে লাগল, তখন ১৯৮৮ সালে জিয়া জুনিজোর রাজত্বও শেষ করে দেয়।

জিয়াউল হকের পরিচিত

জিয়াউল হকের পিতা রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে সম্পর্কিত স্টাফ ক্লার্ক ছিল। জিয়াউল হকের ১৯৪৩ সালের মে মাসে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মিতে কমিশন লাভ হয় এবং সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা সীমান্তে জাপানীদের বিরুদ্ধে নিজ মনিব বৃটেনের পক্ষে প্রতিরোধ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর সে আমেরিকায় 'আমেরিকান সেনাবাহিনীর স্টাফ কলেজ কেন্সাস' এ সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। যাতে নতুন মনিব আমেরিকার গোলামীর সিষ্টেম শিখে নেওয়া যায়। তারপর এই গোলামীর বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ থেকে নিয়ে ১৯৭০ পর্যন্ত

ব্রিগেডিয়ার হিসাবে জর্দানে নিয়োজিত থাকে, যেখানে সে ইসরাঈলকে রক্ষার জন্য ফিলিস্তিনীদের হত্যায় নিজের হাত রঙ্গিন করে।

ব্লাক সেপ্টেম্বর, ফিলিস্তিনীদের হত্যা ও জিয়াউল হক

১৯৪৮ সালের মে মাসে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সাথে সাথে অনেক ফিলিস্তিনী মুসলমান জর্দানের দিকে চলে যায়। জর্দান নদীর পশ্চিম তীর থেকে নিয়ে জর্দানের আম্মান পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ফিলিস্তিনী মুহাজিরদের ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছে। তারপর এখান থেকে ফিলিস্তীনের আযাদির জন্য ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কয়েকটি ফিলিস্তিনী সংগঠন গড়ে উঠে, যেগুলোর মারকাজ ছিল এই ফিলিস্তিনী ক্যাম্পগুলোই। এখান থেকে ফিলিস্তিনীরা ১৯৬৫ এর জানুয়ারীতে ইসরাঈলের উপর হামলা করে এবং তারপর ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাঈল পশ্চিম তীরও দখল করে নেয়, যার পরে ফিলিস্তিনী মুহাজিরীনের ক্যাম্প জর্দানের আরো শহরের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়।

আমেরিকা ও ইসরাঈল যখন দেখল যে, জর্দানে অবস্থিত ফিলিস্তিনীদের এই ক্যাম্পগুলো ইসরাঈল ও পশ্চিমা শক্তির জন্য বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং জর্দানের বাদশা শাহ হুসাইন অনুভব করল যে, ফিলিস্তিনীদের প্রভাব ও গভীরতা জর্দানে বেড়ে চলছে, তখন আমেরিকা ও জর্দানের সরকার সিদ্ধান্ত নিল, এই ফিলিস্তিনী মুহাজির ক্যাম্পগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে। এ সকল

অভিযানগুলোর ফলে ১৯৬৯ সালে জর্দান সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনী ফেদায়ীদের মাঝে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে।

সবশেষে আমেরিকা ও জর্দান ফিলিস্তনীদেরকে গণহত্যা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময়গুলোতেই আমেরিকার পরীক্ষিত গোলাম জিয়াউল হক জর্দানে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কোর্সের তত্ত্বধান করছিল। আমেরিকা তাকে এই যিম্মাদারী সোপর্দ করে। জিয়াউল হক, যে ওই সময় ব্রিগেডিয়ার ছিল, জর্দান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইনচিফ 'হাবেস আল'মুজাল্লা'র সাথে মিলে অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী করে। ১৬ সেপ্টেম্বর জিয়াউল হকেরই তত্ত্বধানে জর্দান সেনাবাহিনী আম্মান, ইরবাদ, আসলাত, যারকাসহ কয়েকটি শহরে ফিলিস্তিনী ক্যাম্পগুলোর উপর ট্যাংক দিয়ে চড়াও হয় এবং নির্দয়ভাবে বোমাবর্ষণ করে। কয়েকদিন পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তারপর অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোর কারণে এই ধারা বন্ধ হয়।

তারপর ২৭ সেপ্টেম্বর জর্দান সেনাবাহিনী দ্বিতীয়বার হামলা শুরু করে এবং ফিলিস্তিনী মুজাহিদগণকে আযলান ও জারশের পাহাড় পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসে, যেখানে পরে আবার নির্দয়ভাবে বোমা বর্ষণ করা হয়। এভাবে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার ফিলিস্তিনীকে এই হামলাগুলোর মাধ্যমে হত্যা করা হয়। এ সমস্ত কর্মকান্ডগুলোর মাষ্টারমাইন্ড এবং ফিলিস্তিনীদের হত্যাকারী ছিল আমেরিকার বিশ্বস্ত চাকর জিয়াউল হক। এই অবদানের কারণেই আমেরিকান আশির্বাদে সে

পাকিস্তানে এগার বছর শাসন করে। এই এগার বছরেও সে আমেরিকার খুব নিমকহালালী করে এবং তাদের অঙ্কিত নকশার উপর চলতে থাকে।

আফগানিস্তানে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিয়ার অংশগ্রহণের হাকিকত

জিয়াউল হকের শাসনামলে যখন ১৯৭৯ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা করল, তখন পাকিস্তান এই আশঙ্কা করল যে, রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করার পর বেলুচিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে গরমপানি পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত: আমেরিকান ব্লকের মধ্যে হওয়ার কারণে আমেরিকাও চাচ্ছিল, আফগানিস্তানে রাশিয়া পরাজিত হোক। এজন্য আমেরিকার ইঙ্গিত ও সাহায্যে জিয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের অনেক লোক এমন মনে করে যে, জিয়া ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামের ভালবাসায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি মুজাহিদগণকে সাহায্য করেছে। অথচ এ সব বাস্তবতার বিপরীত। এর জন্য কাহিনীও বানানো হয়েছে এবং বলা হয় যে, জিয়াউল এত পাক্কা মুসলমান যে, তাহাজ্জুদ নামাযও তার কাযা হত না! যদি এমনই হত, তাহলে আমেরিকার ঝুলিতে বসে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কী কারণ?

আসল কথা এটাই যে, জিয়াউল হক ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী- যেমনটা আমরা উপরে বলেছি- আমেরিকার পরিপূর্ণ গোলাম সেনাবাহিনী ছিল এবং নিজেদের সমস্ত পদক্ষেপগুলোতে আমেরিকান বিধি-নিষেধ উপক্ষো করতে পারত না।

এই শাসনামলে এমনই হয়েছে। এখানে আমরা স্বয়ং ঐ সকল জেনারেল ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী লোকদের বরাতে প্রকৃত তথ্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

রূশ হামলার পর জিয়াউল হক নিজের মন্ত্রীপরিষদের মিটিং ডাকল, যার মধ্যে বেসামরিক লোকগণ আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিরোধিতা করে জিয়াউল হককে এর থেকে ফিরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জিয়াউল হক আমেরিকান স্বার্থ রক্ষা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করত: যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা তার সমর্থনে ছিল। ওই সময়ের ডি জি আই এস আই মেজর জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান তার সমর্থন করে বলেছিল: আমরা আমেরিকার প্রক্সিযুদ্ধ আফগানিস্তানে লড়ব। সে মিটিংয়ের মাঝে এই শব্দ পর্যন্ত বলেছে: "কাবুলকে অবশ্যই জ্বলতে হবে। কাবুলকে অবশ্যই জ্বলতে হবে।"

জিয়া এই কাজের যিম্মাদারি তারপরও ওই ডি জি আই এস আই কেই সোপর্দ করে। এই অপারেশন সর্বশেষে আমেরিকান সি আই এ এর অপারেশন সাইক্লোন এর অংশ হিসাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে

আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে সরাসরি 'সি আই এ' ও আমেরিকান বড় বড় পদের লোকেরা। যারা ওই সময় অধিকাংশই পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিল। এ সমস্ত বিবরণ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিটায়ার্টপ্রাপ্ত মুহাম্মদ ইউসুফ নিজ বই- "সাইলেন্ট সোলজার: দি ম্যান বিহাইন্ড দ্যা আফগান জিহাদ জেনারেল আখতার আব্দুর রহমান" এর মধ্যে লিখেছেন।

স্বয়ং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জেনারেলদের স্মৃতিকথা এবং আমেরিকান উচ্চপদস্ত লোকদের বইগুলোর পৃষ্ঠা উল্টান, তাহলে নিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে এই অনুমান করতে পারবেন যে, পাকিস্তানের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ আমেরিকা তোষা পররাষ্ট্রনীতি। আর এই পুরো সময়টাতে পাকিস্তানে সামরিক শাসন এবং স্বয়ং সেনাবাহিনীর ভূমিকার পিছনে আমেরিকা ও তার স্বার্থই মুখ্য ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাযত মুখ্য ছিল না।

এ সকল কর্মকান্ড স্পষ্ট করে পিলডেট পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল: "পাকিস্তান ফরেইন পলিসি: এন ওভারভিউ ১৯৭৪-২০০৪" তার ব্যাপারে উইকিপিডিয়ায় লেখা হয়েছে:

এই আমেরিকান পরিকল্পনা (অর্থাৎ অপারেশন সাইক্লোন) এর পরিপূর্ণ ভরসা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের উপর ছিল, যার আমেরিকান উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ওয়িলসন এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তার আই এস আই

আমেরিকান ফান্ড ও অস্ত্র বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং আফগানিস্তানের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া ও অর্থনৈতিক সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

একথা এখন সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট যে, ওই সময় রাশিয়াকে পরাজিত করতে আমেরিকা অক্ষম ছিল, যার কারণে সে রূশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুজাহিদগণের সাথে সহযোগিতা করেছে। আর এই সহযোগিতার জন্য পাকিস্তানকে মাধ্যম হিসাবে বাছাই করেছে। কিন্তু এ কথাও সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট যে, পাকিস্তান সেই আমেরিকার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বধানেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং ওই সকল উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই করেছে, যা আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল।

এর জন্য জেনারেল আখতার আব্দুর রহমানের উপরোল্লেখিত উক্তিটিই যথেষ্ট। যার মধ্যে সে বলেছে: কাবুলকে জ্বলতেই হবে। তার মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সমর্থনের বিষয়টি কোথায় আছে?

এ কারণেই যখন রাশিয়া পরাজিত হয়ে পলায়ন করল এবং সে সময় এসে গেল যে, মুজাহিদগণ সেখানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, তখন এই "আই এস আই" ই গৃহযুদ্ধের ছক তৈরী করে, যাতে কাবুলকে অবশ্যই জ্বলতে হয়। এই "আই এস আই" ই আহমাদ শাহ মাসুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কারণ সে

আফগানিস্তানে আমেরিকান স্বার্থের রক্ষক ছিল। একথা স্বয়ং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রসিদ্ধ চেলা যায়দ হামিদ বারবার বলেছে।

জেনারেল জিয়াউল হক ও আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব

স্টেভ কোল নিজের বই ঘোষ্ট ওয়ারস; "দি সিক্রেট হিষ্ট্রী দি সি এই এ" এর মধ্যে জিয়াউল হক এবং তার শাসনামলে আমেরিকান প্রশাসনের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে নিজের কথাগুলো আলোচনা করেন:

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান বিশেষভাবে জেনারেল জিয়াউল হকের মার্শাল ল' এর সাহায্যকারী ছিল। সে জিয়াউল হকের সামরিক শাসনকে সে সময় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজের সম্মুখ সারির জোট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রিগানের শাসনামলে নিম্নোক্ত আমেরিকার কর্মকর্তাদের সাথে জিয়াউল হকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং এ লোকগুলো ওই সময় বেশি বেশি পাকিস্তান আসা-যাওয়া করত:

সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:

- সাবেক আমেরিকান সেক্রেটারী অফ স্টেট হেনরি ক্যাসেঞ্জার।
- রিগান শাসনামলে আমেরিকান কংগ্রেসের প্রধান চারলি ওয়িলসন।

- জয়েন হেরিং, সেই নারী, যে জিয়া ও আমেরিকান সরকারের মাঝে নৈকট্য সৃষ্টিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

এই নারী জিয়ার অনেক আকর্ষণীয় ছিল এবং তার এ পর্যায়ের প্রিয় ছিল যে, যদি মন্ত্রীপরিষদের মিটিংয়ের মাঝখানেও তার ফোন এসে যেত, তাহলে জিয়া মিটিং ছেড়ে তার কথা শুনত। জিয়ার সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইয়াকুব খান নিজের স্মৃতিকথাসমূহের মধ্যে লিখেছে: এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল যে, জিয়ার কান তার ধ্যানেই থাকত। জিয়ার সাথে ওই নারীর সম্পর্ক সেই সময় থেকে ছিল, যখন সে জর্দানে ব্রিগেডিয়ার হিসাবে নিয়োজিত ছিল। এই সম্পর্কের কারণে জিয়া সমস্ত নিয়ম-কানুন উচ্চকক্ষে রেখে তাকে পাকিস্তানী কাউন্সিল ভবনের কাউন্সিলর বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমেরিকায় পাকিস্তানী প্রতিনিধি আমেরিকান! এমনিভাবে জিয়া তাকে পাকিস্তানে 'কায়েদে আজম' সনদও দিয়েছে।

ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাগণ:

- প্রতিরক্ষা সহ-সেক্রেটারী মাইকেল পিলসবারী।
- আমেরিকান গোপন সংস্থা সি এই এ এর অফিসার গাস্ট এভ্রেকটরস।

সেনা অফিসারগণ:

- চেয়ারম্যান জয়েন্ট চীফস অফ স্টাফ জেনারেল ওইলিয়াম।
- জেনারেল হারবার্ট।

- রিগান নিজেও যেহেতু আমেরিকানদের দৃষ্টিতে বর্ণনাপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিল, এজন্য সে জিয়াকেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে ইসলামের বর্ণনাপ্রেমী ধারাটিকে নিজ দেশে প্রসার করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিয়াউল হক তার সাবেক সেনাজীবনে ও শাসনামলে আমেরিকার ইঙ্গিত পরিচালিত একজন কর্মকর্তা ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় খেদমত এই জেনারেল জিয়াই করে।

জেনারেল জিয়ার ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক

আমরা এতক্ষণে উপরে দেখে এসেছি যে, জিয়া জেনারেল ইয়াহইয়ার সময়ে জর্দানে ফিলিস্তিনীদের উপর হামলা করে আমেরিকা ও ইসরাঈলের সাথে নিজের বিশেষ সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু জনাবের মধ্যে এই সংশয় আছে যে, সম্ভবত জিয়া পরবর্তীতে তাওবা করে ফেলেছে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। স্বয়ং এই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিয়া শুধু আমেরিকার গোলামীর দায়িত্বই পালন করেনি, বরং সরাসরি ইসরাঈলের চাকুরীও করেছে। আমেরিকান উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা চারলী ওয়িলসনই বলেছে, যে আমেরিকা ও জিয়ার মাঝে মধ্যস্থতাকারী ছিল- জিয়া এই অপারেশনে সরাসরি ইসরাঈলীদের সাথেও লেন-দেন করেছে। তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক করেছে। তাদেরকে

সুযোগ করে দিয়েছে, যাতে সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। আই এস আই এর সাহায্যে ইসরাঈলী গোপন সংস্থা মোসাদ রাশিয়ান অস্ত্র বিধ্বস্ত করার অস্ত্র আফগানিস্তানে প্রেরণ করেছে। ওয়িলসনের নিজের ভাষায়, জিয়া ইসরাঈলী গোপন সংস্থাকে শুধু এতটুকু বলেছে যে: শুধু এতটুকু করুন যে, অস্ত্রের ডিপোর উপরে ডেভিড তারকার চিহ্ন দিবেন না।

জিয়াউল হকের পাকিস্তানে ইসলাইজেশনের প্রচেষ্টাসমূহ

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু এটা প্রমাণ করা যে, এই দেশে সেনাবাহিনীই আসল শক্তি আর এই শক্তি আমেরিকান স্বার্থরক্ষাকারী। এ কারণেই এ শক্তি এদেশে প্রকৃত ইসলামের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই পটভূমিতে কেউ চিন্তা করতে পারে যে, যদি এই দেশে কোন শাসক ইসলামাইজেশনের প্রচেষ্টা করে থাকে, তাহলে সে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকই। এজন্য আমরা তার উপর একটু নজর বুলাবো:

প্রথমে এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, এ স্তরটি আগের ধোঁকাবাজির স্তর-ই ছিল, যার পটভূমি পূর্বের শাসকরাই তৈরী করে রেখেছিল, যেমনটা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। জেনারেল ইয়াহইয়ার পরে যখন জুলফিকার আলী ভুট্টোও ক্ষমতায় আসল, তখন কমিউনিষ্ট চিন্তা-ভাবনার ধারক হওয়া সত্ত্বেও সেও ইসলামাইজেশনের ধোঁকা অব্যাহত রেখেছে। সে নিজের শাসনামলে কাদিয়ানীরা

কাফের বলে আইন পাস করেছে। মদ পান, মদ বিক্রয় করা ও নাইট ক্লাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কিন্তু ভুট্টোর পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সেক্যুলার বানানোর প্রচেষ্টার মোকাবেলায় এতটুকু ছিল, আটার মধ্যে লবণ যতটুকু ছিল। আর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যেন কোথাও প্রকাশ্য কুফর দেখে মুসলমানরা জ্বলে না উঠে।

এই স্তরটিকেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউক হক বহাল রেখেছে। কিন্তু ওই সময় আমেরিকার প্রয়োজন ছিল যে, কমিউনিষ্ট চিন্তা-ভাবনার বিপরীতে ইসলামের নাম প্রকাশ্যে নেওয়া হবে। আমরা পড়েও এসেছি যে, স্বয়ং রিগানই পাকিস্তানে ইসলামাইজেশনের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল এবং এ কাজের মধ্যে আমেরিকার সন্তুষ্টি ছিল।

দ্বিতীয় কথা হল, এটা যাচাই করার বিষয় যে, জিয়াউল হকের শাসনামলে কি পরিমাণ ইসলামাইজেশন কার্যকর হয়েছে? এমন তো নয়, যে ডাকঢোল বেশি, কাজ কম? জিয়াউল হকের পক্ষ থেকে যে সকল ইসলামী করণের চেষ্টা করা হয়েছে, তার মধ্যে মৌলিকভাবে দু'টি কাজ হয়েছে:

ক. আদালতগুলোকে শরয়ী বেঞ্চ বানানো হয়েছে।

খ. হুদুদ অর্ডিনেন্স জারি করা হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম জানেন যে, এ দু'টির মাধ্যমে পাকিস্তানে কী পরিমাণ ইসলাম এসেছে। শরয়ী বেঞ্চ একটি মুনাফেকী পদক্ষেপ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে নিচের তিনটি কথাই যথেষ্ট:

১. শরয়ী বেঞ্চের সমস্ত জজ উলামায়ে কেরাম ছিল না। বরং তাতে ইংরেজী আইনজীবীরাও ছিল। তাহলে ইংরেজী আইনবিদদের সেখানে কী কাজ?

২. শরয়ী বেঞ্চ তাদের সিদ্ধান্তসমূহে একক ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। বরং তাদের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেত। আর সেখানে নিখাদ ইংরেজী আইনজীবীদের ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ শরীয়ার আলোকে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিন্তু তারপর এটা শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ ইংরেজী আইনজীবী জজের সামনে পেশ করা হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শরীয়তের ব্যাপারে অজ্ঞ জজেরই হবে।

৩। শরয়ী বেঞ্চের কার্যপরিধিও সীমিত ছিল। তারা যেকোন প্রকার মু'আমালার ফায়সালা করতে পারত না।

আর হুদুদ অর্ডিনেন্স যে প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে, তার জন্য তিনটি কথাই যথেষ্ট:

প্রথম কথা হল: হুদুদ অর্ডিনেন্সে অনেক জায়গা এমন আছ, যা শরীয়তের নির্ধারিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং তাতে অনেক কিছু যুক্ত করা

হয়েছে। এ কারণেই আজও পর্যন্ত পাকিস্তানে কোন হদ কার্যকর হয়নি। হদের সমস্ত মামলাগুলোতে হুদুদ অর্ডিনেন্সের আলোকে মানুষের বানানো বিভিন্ন প্রকার শাস্তিই কার্যকর হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় কথা হল: হুদুদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু ফায়সালার সমস্ত কার্যক্রম, সাক্ষীদের যাচাই বাছাই, প্রমাণ যোগার করা, সব কিছুই পাকিস্তানী দন্ডবিধির ইংরেজী আইনানুযায়ী।

তৃতীয় কথা হল: ফায়সালা করার জন্য শরীয়ত সম্পর্কে অবগত কাযী নির্ধারণ করা হয়নি। বরং ইংরেজী আইনবিদ জজরাই হুদুদ সম্পর্কিত মামলাগুলোরও ফায়সালা দিত।

যদি হুদুদ অর্ডিনেন্স চালুকারী বাস্তবেই ইসলাম আনয়নের চেষ্টা করত, তাহলে তো উলামায়ে কেরাম তত্ত্বধানে আইন প্রণয়ন করত এবং তারপর এই আইন মোতাবেক ফায়সালা দেওয়ার জন্য শরীয়ত সম্পর্কে অবগত কাযী নিয়োগ দিত এবং ইংরেজী আইনবিদ জজদেরকে বরখাস্ত করত। তারপর এর কারণ কি যে, ইসলাম শুধু হুদুদ অর্ডিনেন্স পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং সমস্ত ইংরেজী আইনগুলোকে কেন শরয়ী আইনে রূপান্তরিত করা হল না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন সুদের ব্যাপারটি উত্থাপন করা হল, তখন নির্দেশ জারি করা হল যে, আগামী দশ বছর পর্যন্ত কেউ হাঙ্গামা করবে না।

এ সকল বিষয়গুলো দ্বারা জানা যায় যে, জিয়াউল হকের শাসনামলে ইসলামাইজেশনের প্রচেষ্টাও অতীতের মত শুধুমাত্র পাকিস্তানের মুসলমানদের চোখে ধুলি দেওয়ার মত। আসল উদ্দেশ্য হল, সামাজিক চিত্র দেখে...ইসলামের নাম ব্যবহার করে, নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং শাসন ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তিকে শক্তিশালী করা।

জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যু এবং জেনারেল আসলাম বেগের কর্মকৌশল

১৯৮৮ সালের আগষ্টে জিয়া নিজের কয়েকজন সিনিয়র অফিসারসহ বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। দেশের অবস্থা সেনাবাহিনীর অনুকূল ছিল না। পাকিস্তানী জনগণ সেনাশাসনের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। জেনারেল জিয়াউল হকের নায়েব ভাইস চিফ অফ আর্মি স্টাফ ছিল জেনারেল আসলাম বেগ। সে জিয়ার মৃত্যুর পর চিফ অফ আর্মি স্টাফের পদটি দখল করে নেয় এবং নিজে শাসনক্ষমতায় আসার পরিবর্তে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পাকিস্তানের ইতিহাসে জেনারেল আসলাম বেগ কর্মকৌশল পরিবর্তন করল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সামনে থেকে দেশীয় বিষয়াসয়ে সেনাবাহিনী পর্দার আড়ালে থেকে নিজেদের ক্ষমতা বহাল রাখবে। আর সরাসরি সরকারে আসা থেকে বেঁচে থাকবে। এই কর্মকৌশলটি বেশ সফল হয়েছে।

পূর্বের এগার বছর জেনারেলরা নামকা ওয়াস্তে গণতান্ত্রিক শাসন ও শাসকদেরকে সামনে রেখেছে। কিন্তু তাদের লাগাম পর্দার আড়ালে নিজেদের হাতে রেখেছে। জেনারেল আসলাম বেগের পরে জেনারেল আসিফ নওয়াজ, জেনারেল আব্দুল ওয়াহিদ কাকড় ও জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামত এই কর্মকৌশলই মেনে চলেছে। পাকিস্তানে সেটাই চলত, যা জেনারেলরা চাইত। পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতিগুলো জেনারেলদের কথামতই চলত।

এগার বছর পর ১৯৯৯ সালে আরেকবার জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করে নেয়। আমরা চাইলে এ সকল শাসনগুলোর ব্যাপারেও বিস্তারিত কথা বলতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু এগুলো নিকটবর্তীকালের বিষয় এবং প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমানের নিকটই জেনারেল পারভেজ মোশাররফের অবস্থা পরিপূর্ণ স্পষ্ট। এজন্য এখানে তার ব্যাপারে কথা বলছি না।

জেনারেল পারভেজ তো পূর্ববর্তীদের অবশিষ্ট অংশটুকুও পুরা করে ফেলেছে এবং এই নতুন শতাব্দিতে সন্ত্রাসবাদের নামে আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তার মধ্যেও জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পুরো পাকিস্তানকে জড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে এই দেশে জেনারেলরা এখন আমেরিকার ওফাদারী করতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের পটভূমি তৈরী করেছে এবং দ্বীনদার শ্রেণীকে নিজেদের টার্গেট বানিয়েছে। জেনারেল পারভেজের

পরে আগত সেনাবাহিনীর জেনারেলরাও সেই রাস্তায়ই চলছে এবং সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের মুঠের ভিতর নিয়ে সেই নকশার উপরই পরিচালিত করছে।

শেষকথা: সেনাবাহিনীর জেনারেলরা পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে না। বরং তারা পাকিস্তান ধ্বংসের কারণ

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কথা এটাই যে, এই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ঐ সকল রাজনীতিবিদরাও নয়, যারা বিগত সত্তর বছর ধরে এ দেশের রাজনীতির অংশ হয়ে আছে এবং যারা প্রত্যেক বিকাশমান সূর্য্যরেই সালাম করেছে। আর ওই সকল জেনারেল শ্রেণীও উপযুক্ত নয়, যারা এই দেশকে বন্ধকের বস্তু বানিয়ে রেখেছে। পাকিস্তানের হেফাযত ও রক্ষা না গণতন্ত্রের কুফরী শাসনব্যবস্থার মাঝে, না জেনারেলদের সামরিক শাসনের মাঝে। এই উভয় শ্রেণী এই দেশের সমস্যাগুলো প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিই করেছে এবং এর নিম্নগামিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে।

প্রত্যেকবার যখনই কোন রাজনীতিবিদ বা জেনারেলের হাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো এসেছে, তখনই জনগণ ক্ষোভে জ্বলে উঠে বিরোধিতা করতে থেকেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো একটি আরেকটি সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। তখন সে নিজের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের শেষ ভাষণ

দেখুন। জেনারেল ইয়াহইয়ার শেষ ভাষণ দেখুন। জেনারেল জিয়ার তো ভাষণেরই সুযোগ হয়নি। জেনারেল মোশাররফের শেষ ভাষণ দেখুন।

এ সব থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জেনারেল শ্রেণী এ দেশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে, দেশের জনগণকে বকরি-ভেড়া মনে করে এদিকে ওদিকে হাকাতে পারে, নিজেদের সিন্ধুক ভরে নিজেদের জীবন যাপন বিলাসী বানাতে পারে, কিন্তু দেশের ভাল অবস্থা, উন্নতি এবং এখানে ইসলাম কার্যকর করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। এর কারণ হল, এই শ্রেণী হাজারো দেশপ্রেমের দাবি করুক না কেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু শুধু নিজের দুনিয়া, এজন্য তারা কখনো মুসলমানদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থের প্রতি খেয়াল করে না। বরং ব্যক্তিগত স্বার্থকেই এ সবের উপর প্রাধান্য দেয়।

জেনারেল রাহেল শরীফ ও তার স্থলাভিষিক্ত কাদিয়ানীপ্রেমী জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়াহ

যে জেনারেলই এসেছে এবং যে-ই রাজনীতিবিদদেরকে নিজের লাঠির মাধ্যমে পরিচালিত করেছে, সে-ই এই দেশের অবস্থা দ্বিগুণ খারাপ করেছে, অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস করেছে, ধর্মহীনতার প্রচার করেছে, দ্বীনদার শ্রেণীর উপর কঠোরতা করেছে এবং দ্বীনের উপর আমল করা পর্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। এই দেশের প্রকৃত গন্তব্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে আরো দূরে ঠেলে দিয়েছে এবং

আমেরিকাসহ বৈশ্বিক শক্তিগুলোকে প্রকাশ্যভাবে মজলুম মুসলমানদেরকে নিয়ে খেলা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর যদি কোন উদ্দেশ্য সাধন হয়ে থাকে, তাহলে তা এই যে, সেনাবাহিনী খুব ফুলে ফেপে উঠেছে, সেনাবাহিনীর অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়েছে, জেনারেলদের সেভস একাউন্ট ভরে গেছে, কোর কমান্ডাররা কোটিপতি কমান্ডার, বরং বিলিয়নপতি কমান্ডার হয়ে গেছে। পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে গোলাম বানানো এবং তাদের রক্তপানের জন্য আরো অধিক উদ্যমী হয়ে উঠেছে।

এ সকল ইতিহাস বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, যেন আমরা পাকিস্তানী মুসলমান হিসাবে এই আমেরিকার গোলাম ও ইসলামের শত্রু সেনাবাহিনীর ভূমিকা বুঝতে পারি এবং এখন যে মিডিয়ায় এক খবিস ব্যক্তি জেনারেল রাহিল শরীফকে সিপাহসালার বানিয়ে পেশ করছে এবং যে এই তিন বছরে পাকিস্তানী রাজনীতিকে নিজের বাহুতলে নিয়ে নিয়েছে, যার দেশপ্রেম ও দেশ হেফাযতের ডাকঢোল পিটানো হচ্ছে, তার ভূমিকাও নিশ্চিতভাবেই তার পূর্বসূরীদের থেকে ব্যতিক্রম নয়। বরং সে তার পূর্বসূরীদের থেকেও কয়েক পা এগিয়ে যাচ্ছে:

তার পূর্বসূরীরা তো অন্তত মুনাফেকী করে ইসলামের নাম নিয়েছে, কিন্তু সে একুশতম সংশোধনী পাস করে ইসলামকে এই দেশে অচ্ছুত বানিয়ে দিয়েছে এবং পাকিস্তান বিল নামে দ্বীনদারীকেই অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

তার পূর্বসূরীরা তো এই দেশকে শুধু আমেরিকার গোলাম বানিয়েছে, কিন্তু সে আমেরিকার সাথে সাথে চীনের গোলাম বানানোরও সকল পরিকল্পনা করে ফেলেছে এবং দেশীয় অর্থনীতির উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দিয়েছে। তার পূর্বসূরীরা তো এই দেশের উপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরোধীদেরকে শুধু জেলে ঢুকিয়েছে এবং জুলফিকারকে হত্যার কারণে জিয়াকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু এই খবিস রাহিল শরীফ এই দেশের দৈর্ঘ্য-প্রস্তের মাঝে ইসলামপ্রেমী ও বিরোধী রাজনীতিবিদদেরকে বিরাট সংখ্যায় আদালতের বাইরে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করিয়েছে। আর এই ধারা এখনো বন্ধ করার কোন নাম নেই।

তার পূর্বসূরীরা তো কাবায়েলী মুসলমানদেরকে মুনাফেকী করে হলেও নিজেদের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে ভবঘুরে হতে বাধ্য করেছে। আজ কয়েক লাখ মুসলমান নিজেরই ভূমিতে মুহাজিরীন ক্যাম্পে সংকটাপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

তার পূর্বসূরীরা নামকাওয়াস্তে হলেও নিজেদের সরকারী কাগজপত্রে ভারতকে প্রথম শত্রু স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এই সে নিজের স্থলাভিষিক্ত জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়ার সাথে মিলে সামরিক রেষ্ট হাউজে সর্বপ্রথম দুশমন সন্ত্রাসী, তথা পাকিস্তানের মুজাহিদদেরকে সাব্যস্ত করেছে এবং সমস্ত সামরিক

ব্যবস্থাপনা পাকিস্তানের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নতুন করে সুবিন্যস্ত করেছে।

তার পূর্বসূরীরা পাকিস্তানে সাংবাদিকতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং কতগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করার মাধ্যমে তার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে তো পুরো দেশীয় সাংবাদিকতাকে সেনাবাহিনীর আই এস পি আর এর অনুগত বলে রুল জারি করেছে।

তার পূর্ববর্তীরা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মত উপকরণগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে নড়াচড়া বন্ধ করেছে। কিন্তু সে তো জিহাদকেই বিদ্বেষ ছড়ানো বলে সাব্যস্ত করেছে এবং সীরাত ও তাফসীরের কিতাবগুলোর উপর পর্যন্ত এই প্রিয় দেশ পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। যার প্রতিষ্ঠায় এই প্রতিশ্রুতির উপর হয়েছিল যে, এখানে কুরআনের আইন ও সীরাতের জিন্দেগী চালু হবে।

জেনারেল রাহিল শরীফ তো পাকিস্তানের ইসলামের জানাযা পড়িয়ে ফেলেছে এবং ইসলামের সাথে শত্রুতার সমস্ত সীমা ছেড়ে গেছে। তার উপর আরো অতিরিক্ত বিষয় হল, তার স্থলাভিষিক্ত জেনারেল কমর জাভেদ বাজওয়াহ যেখানে জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে দুশমনী ও ভারতপ্রেমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেখানে সে যদি নিজে কাদিয়ানী নাও হয়, তবে কাদিয়ানীপ্রেমী অবশ্যই। তার

ব্যাপারে সাংবাদিকতার জগতে এই একথা প্রসার লাভ করেছে যে, তার অধিকাংশ আত্মীয় কাদিয়ানী এবং সে প্রধান হলে পাকিস্তানে কাদিয়ানিয়্যাতের প্রচার ও তার শক্তি অর্জিত হবে।

আফসোস! পাকিস্তানের আইন যেমনিভাবে আল্লাহর হাতে সার্বভৌমত্ব সোপর্দ করা সত্ত্বেও ইসলাম কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা, তেমনিভাবে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে কাদিয়ানীদের হাতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এ কাজের সমস্ত দায়িত্ব এই নিকৃষ্ট সেনাবাহিনী পালন করে আসছে।

পাকিস্তানের প্রকৃত রক্ষক ও কল্যাণকামী হলেন মুজাহিগণ

পাকিস্তানের মুসলমানদের জানা উচিত যে, আমাদের প্রিয় দেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, কল্যাণ, উন্নতি ও হেফাযত একমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়নের মাঝেই। সেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যার জন্য সত্তর বছর পূর্বে এই দেশ অর্জিত হয়েছিল। এটা সেই শরীয়ত, যাকে আল্লাহ তা'আলা চৌদ্দশত বছর পূর্বে নিজের প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছিলেন। পাকিস্তানে এই পরিবর্তন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পথ একমাত্র জিহাদ ও বিপ্লব। পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্জনের যিম্মাদার শুধুমাত্র মুজাহিদগণ, যারা ইতিপূর্বে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে এবং

আজ আমেরিকা ও ইসরাঈল সহ বিশ্বশক্তিগুলোর মোকাবেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে অটল অবিচলভাবে লড়ে যাচ্ছে, যাদেরকে বিশ্ব 'আল'-কায়েদা' ও 'তালেবান' নামে জানে, যাদের নেতৃত্ব ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের হাতে।

পাকিস্তানেও এই শ্রেণীই পাকিস্তানের মুসলমানদের অতন্দ্র প্রহরী এবং এই শ্রেণীই এই দেশে ইসলাম ও শরীয়ত বাস্তবায়নের পতাকা উত্তোলনকারী। সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানের দ্বীনদার জনগনের জন্য জেনারেল, জায়গীরদার ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদদের থেকে আরো অধিক ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। নিজেদের প্রকৃত গন্তব্য ও তা অর্জনের রাস্তা জানা উচিত। আর সেই রাস্তা হল, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে নির্মূল করা এবং শাসকশ্রেণী ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে জবান ও কলম ব্যবহার করা, রাজপথে নেমে আসা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****